নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খণ্ড ৮

জুলাই ২০০০

ব্র্যাক
গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ

গ্রন্থস্বত্ব : ব্র্যাক

প্রকাশকাল : জুলাই ২০০০

প্রকাশক : ব্র্যাক, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭৫ মহাখালী
ঢাকা ১২১২

মুদ্রণ : ব্র্যাক প্রিন্টার্স
৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১২১২

১৯৯৭-এর গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত ১৬টি এবং ১৯৯৯-২০০০-এর ৪টি রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।

মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নহেন। প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত সকল মতামত গবেষকগণের একান্ত নিজস্ব।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক : আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী
সম্পাদক : হাসান শরীফ আহমেদ
সদস্য : সালেহউদ্দীন আহমেদ, আমিনুল আলম, পূরবী দত্ত,
কানিজ ফাতেমা, সাদিয়া এ চৌধুরী
ও মু. গোলাম সাত্তার

Nirjash: Summary of selected BRAC research reports of 1997, Number 8, July 2000. Published by BRAC, Research and Evaluation Division, 75 Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh.

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়   ১

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশুদের মৌলিক শিক্ষার উন্নয়নে ব্র্যাকের
শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব   ৩

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: নিরাশাও নয় আত্মতুষ্টিও নয়   ৭

বিবাহ, জন্মনিরোধ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব: একটি সমীক্ষা
১১

আয়-উৎপাদনশীল সম্পদের উপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ: ব্র্যাকের
ঋণ কর্মসূচির ভূমিকা   ১৪

বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের উপর সহিংসতা   ১৭

ব্র্যাক সেন্টারের আশেপাশে মহাখালীর বস্তিবাসী: একটি সমীক্ষা   ১৯

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর ব্র্যাকের পল্লী
উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব   ২১

খাদ্য সাহায্য ও টেকসই উন্নয়ন: ক্ষুধা নিবারণে ব্র্যাকের ভূমিকা   ২৪

জনসংখ্যা কাঠামো ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা পরিবর্তনে
আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের প্রভাব: গ্রামীণ বাংলাদেশের একটি সমীক্ষা   ২৭

বাংলাদেশে বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা   ৩০

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য সেবিকাদের কাজ ছেড়ে দেয়ার কারণসমূহ   ৩৪

জাতীয় টিকা দিবস: জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ছে কি?   ৩৭

মুক্তাগাছায় ব্র্যাকের পুষ্টি প্রকল্প ৩৯

গ্রামাঞ্চলে শিশুদের অসুস্থতার ধরন: একটি সমীক্ষা ৪৩

মতলব থানার বয়স্ক জনগোষ্ঠির পুষ্টিজনিত সমস্যা ৪৬

কম জন্মওজন ও শিশুমৃত্যু: গ্রাম বাংলার একটি চিত্র ৪৯

ব্র্যাক সদস্য ও সদস্য নয় এমন পরিবারে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ধরন: মতলব এলাকার একটি সমীক্ষা ৫২

স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্র্যাক কর্মসূচির প্রভাব: ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি যৌথ গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল ৫৫

গর্ভকালীন রক্তস্বল্পতা: একটি গ্রামীণ পটভূমি ৫৭

কক্সবাজার জেলায় রিকেট্স রোগের ব্যাপকতা ৬০

সম্পাদকীয়

উন্নয়নের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ, উন্নয়ন কার্যক্রমের বিকাশ ও তার ফলাফল মূল্যায়নে গবেষণা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি। এই উপলব্ধি থেকে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্ম। এ বিভাগ আজ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত'শ গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এর প্রায় সবই ব্র্যাক কর্মসূচির উপর পরিচালিত। এ ছাড়াও এ বিভাগ দেশী-বিদেশী বিভিন্ন উন্নয়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সরকারের অনুরোধে কিংবা এদের সাথে যৌথভাবে গবেষণা করে থাকে। প্রায় প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদনই ইংরেজী ভাষায় রচিত। এই প্রতিবেদনগুলো থেকে বাছাইকৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের বাংলা সার-সংক্ষেপ হল নির্যাস। মাঠ পর্যায়ে ব্র্যাকের হাজার হাজার উন্নয়ন কর্মীর কাছে এ সকল গবেষণার ফলাফল পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যেই নির্যাস প্রকাশিত হয়ে আসছে। এছাড়া মাঠকর্মীদের সাথে গবেষণা বিভাগের একটি অন্যতম যোগসুত্র বা সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে এই নির্যাস। তাছাড়াও ব্র্যাকের এক কর্মসূচির কর্মী অন্য কর্মসূচি সম্পর্কে নির্যাস-এর মাধ্যমে জানতে পারছেন।

নির্যাসের একটি খন্ডে সাধারণত: একটি নিদিষ্ট বছরে পরিচালিত গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ স্থান পায়। নির্যাসের ৭ম ও ৮ম খন্ডে স্থান পেয়েছে ১৯৯৭-এ পরিচালিত ৩৬টি নির্বাচিত গবেষণার ফলাফল।

গবেষণার ফলাফল মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের কাছে তুলে ধরার একটি পদক্ষেপ হিসেবে নির্যাস প্রকাশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর যথার্থতা মিলেছে সম্প্রতি নির্যাস বিষয়ে একটি গবেষণার ফলাফল থেকে। নির্যাস প্রকাশনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা কিংবা নির্যাসের ভাষা, প্রচ্ছদ, ইত্যাদির কোন পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা জানার জন্য গৃহীত এ সমীক্ষায় দেখা গেছে, নির্যাস সম্পর্কে জানেন অর্ধেকেরও কর্ম সংখ্যক মাঠকর্মী। কিন্তু যারা জানেন তাদের প্রায় সকলেই নির্যাস পড়েন। ফলাফলে আরো দেখা গেছে, যারা নির্যাস পড়েন তাদের প্রায় সকলেই এর প্রয়োজনীয়তার কথা উলেল্খ করেছেন এবং প্রশংসা করেছেন। গবেষণার ফলাফল সরাসরি মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য ১৯৯৯ সাল থেকে এ বিভাগ আরেকটি পদক্ষেপ নিয়েছে, তা হল মাঠ পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা। ব্র্যাকের চারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯৯৯-এর এপ্রিল-মে মাসে চারটি আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত বছরের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ এ কর্মশালাকে গবেষণা উৎসব কিংবা গবেষণা সম্মেলন বলে অভিহিত করেন। এ

ধরনের কর্মশালার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তারা আরো অধিক সংখ্যক কর্মশালা বা সম্মেলনের আয়োজন করার জোড়ালো অভিমত ব্যক্ত করেন। তাদের এই দাবির প্রেক্ষিতে এ বছর মাঠপর্যায়ে মোট আটটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

ইংরেজী ভাষায় রচিত গবেষণা প্রতিবেদগুলোকে বাংলায় সহজ-বোধ্যভাবে ও সংক্ষেপে বই আকারে প্রাকশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েজেন মাঠকর্মীগণ। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্যাসের প্রশংসা করেছেন।

ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য এ সংখ্যার নির্যাসে বিদেশী কাগজের পরিবর্তে দেশী কাগজ ব্যবহার করা হলো। প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে এক রং ও তুলনামুলকভাবে সস্তা বোর্ড ব্যবহার করা হয়েছে।

নির্যাস প্রকাশনার পর থেকে আমরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন কর্মী, গবেষক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। অনেকেই নির্যাসকে একটি সমৃদ্ধ প্রকাশনা বলে অভিহিত করেছেন। আপনাদের এই প্রেরণার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের পরামর্শ নির্যাসের সমৃদ্ধিতে অপরিসীম সহায়তা করেছে। তাই আপনাদের মতামতকে আমরা স্বাগত জানাই এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমরা আপনাদের মতামত, সমালোচনা ও পরামর্শের প্রত্যাশী।

বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশুদের মৌলিক শিক্ষার উন্নয়নে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব*

সমীর রঞ্জন নাথ

শিক্ষা শুধুমাত্র উন্নয়নের গতিই বৃদ্ধি করেনা, জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জনেও প্রস্তুত করে। এই বিশ্বাস থেকে ১৯৮৫ সালে ২২ টি পরীক্ষামূলক স্কুল নিয়ে ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের জনগণের শতকরা ৪০ ভাগের অবস্থান দারিদ্র্য সীমার নিচে। শতকরা ৪৬ ভাগের বয়স চৌদ্দ বছরের কম। দরিদ্র ও অশিক্ষিত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাদানে সরকারের সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রমে কার্যকরী অবদান রাখা ও মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশেসমূহের শিশুদের শতকরা ৮০ ভাগের মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সামগ্রিকভাবে নিরক্ষরতার হার হ্রাস করা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির উপর এ সম্মেলনে জোর দেয়া হয়।

বর্তমানে ব্র্যাক বয়স ভিত্তিক দুই ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রেখেছে, ৮-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য তিন বছর মেয়াদী মৌলিক শিক্ষা অপরটি ১১-১৪ বছর বয়স্কদের জন্য কিশোর-কিশোরীদের মৌলিক শিক্ষা। অন্যান্য এলাকায় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তারের জন্য শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচির আওতায় ব্র্যাক স্থানীয় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। কমপক্ষে ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি ব্র্যাক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এই শিক্ষার্থী নিয়েই একটি স্কুল তিন বৎসর চলে। তিন বৎসর পর একইভাবে আবার ৩০-৩৩ জনের আরেকটি দল নিয়ে আরেকটি চক্র শুরু হয়। বেসরকারি খাতে উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলগুলো সাধারণতঃ

---

* 'The impact of BRAC'S education programme on raising basic education levels for the children of rural Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সাইফ উদ্দিন আহমেদ।

এভাবেই পরিচালিত হয়ে থাকে। নারী শিক্ষার হার উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রতি দলে কমপক্ষে শতকরা ৭০ জন মেয়ে শিক্ষার্থী নেয়া হয়। বর্তমানে সারা দেশে ব্র্যাকের এ ধরনের প্রায় ৩৪,০০০ উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল রয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় দরিদ্র পরিবারের নারীদের প্রাধান্য দেয়া হয় যারা অন্তত নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা ও বহুস্তর বিশিষ্ট তত্ত্বাবধান ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশে শিক্ষার উপর গবেষণা খুবই সীমিত। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি সমস্যা, লিঙ্গ বৈষম্য ও অন্যান্য নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। বিভিন্ন সমীক্ষায় মৌলিক শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা, বাসস্থান সুবিধা এবং মাতা-পিতার শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দেখা গেছে। এই গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশুদের মৌলিক শিক্ষা অর্জনে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তিন ধরনের ছেলে-মেয়েদের উপর এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এরা হল, ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে তিন বছরের কোর্স সমাপ্ত করেছে এমন শিশু, আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে সমপর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন শিশু আর কোন ধরনের স্কুলেই কোন শিক্ষা পায়নি এমন শিশু। শিক্ষার ধরন এবং লিঙ্গ অনুসারে সমান ভাগে বিভক্ত মোট ৭২০ জন ছেলে-মেয়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলো হল মানিকগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, কক্সবাজার এবং কিশোরগঞ্জ। চারটি বিষয়কে মৌলিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এগুলো হল পড়ার দক্ষতা, লেখার দক্ষতা, গণিত ও জীবন দক্ষতা। দেখা গেছে, ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষাগ্রহণকারী ছেলে-মেয়েরা মৌলিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় বেশ এগিয়ে রয়েছে। ব্র্যাকের ছেলে-মেয়েরা জীবন দক্ষতা এবং লেখার দক্ষতায় আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় ভাল করেছে, কিন্তু গণিত দক্ষতা ও পড়ার দক্ষতায় দুই দল ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোন তফাত পাওয়া যায়নি। যে সব ছেলে-মেয়ে কোন স্কুলেই লেখাপড়া করেনি তাদের মৌলিক শিক্ষার স্তর শূন্য। দেখা গেছে, এদের কারো কারো জীবন দক্ষতার জ্ঞান রয়েছে আবার অনেকেরই গণিতে দক্ষতা রয়েছে।

মৌলিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষার্থীদের বয়স, পরিবারের আর্থিক অবস্থা, ও পিতা-মাতার শিক্ষার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মৌলিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বেতার ও টেলিভিশনে সম্প্রচার সুবিধা অবদান রাখছে। স্কুল ত্যাগীদের চেয়ে পরবর্তীতে উচ্চ শ্রেণীতে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান স্বাভাবিকভাবেই অনেক ভাল। শিক্ষিত অভিভাবকগণ সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজন ও উপলব্ধি করেন এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করেন। যেমন, তাদের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দেন ও শিশু শ্রম থেকে রেহাই দেন। ফলে মৌলিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

স্বল্পব্যয়, কার্যকরী ব্যবস্থাপনা ও তদারকি এবং সমাজের অংশগ্রহণের কারণে বেসরকারি খাতের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বেশ ফলদায়ক। এই কার্যক্রমে স্কুল ত্যাগীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। শিক্ষার মান যাচাই করে দেখা গেছে, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক স্কুলের সতীর্থদের তুলনায় অনেক ভাল করেছে। লিখন ও জীবন দক্ষতার ক্ষেত্রেও তুলনামূলক অবস্থান তাদের ভাল। জীবন দক্ষতা শিক্ষার লক্ষ্য হলো পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক জ্ঞান দান করা। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে উক্ত বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস নেয়া হয়।

দেখা যায় যে, যারা ব্র্যাক স্কুলে লেখাপড়া করেছে তাদের শতকরা ৮০ ভাগের মৌলিক শিক্ষা অর্জনে ৫ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন। যদিও একই মান অর্জনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন হবে কমপক্ষে সাত বছর। তদারকি, ব্যবস্থাপনা, ছাত্র হাজিরা, সামাজিক সম্পৃক্ততা ও সহপাঠ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশ দূর্বল। মৌলিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষার্থীদের সমপর্যায়ভুক্ত করতে হলে সরকারি ও বেসরকারি খাতে যৌথ সহযোগিতা ও উদ্যোগ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

উপসংহারে বলা যায় যে,

- গ্রাম বাংলার শিশুদের মৌলিক শিক্ষার মান অর্জনে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অবদান উল্লেখযোগ্য। পড়া ও গণিত দক্ষতা অর্জনে উভয় শিক্ষা ব্যবস্থা সমান কার্যকরী, তবে জীবন দক্ষতা ও লিখনের ক্ষেত্রে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অবদান বেশী;

- মৌলিক শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে কমপক্ষে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে পাঁচ বছর মেয়াদী উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরীক্ষামূলভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে;
- মৌলিক শিক্ষা অর্জনে লিঙ্গ বৈষম্য কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি;
- গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়াতে হলে সরকার ও বেসরকারি পর্যায়ে যৌথ উদ্যোগ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন;
- ১৯৯০ সালের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনে শিক্ষার ন্যূনতম মান বিষয়ে বিধি সংযোজন করা দরকার অথবা এ বিষয়ে নতুন আইন করা প্রয়োজন;
- আনুষ্ঠানিক স্কুলসমূহে শ্রেণী কক্ষের পড়াশুনার উপর আরো জোর দেয়া দরকার; এবং
- উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রম, যেমন নিয়মিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পিতা-মাতার সাথে মাসিক সভা, নিয়মিত তদারকি ও পরিদর্শন, ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। পাঠ্য বিষয়সমূহে গ্রাম বাংলা দৈনন্দিন জীবন ধারার সম্পৃক্ততা ও প্রতিফলন প্রয়োজন।

সার্বিকভাবে এটা বলা যায় যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশুদের মৌলিক শিক্ষার উন্নয়নে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রভূত প্রভাব প্রতিটি স্তরে অনুভূত হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থাঃ নিরাশাও নয় আত্মতুষ্টিও নয়*

আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী, রাশেদা কে চৌধুরী ও সমীর রঞ্জন নাথ

বাংলাদেশ তার সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে এ সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ১৯৯৫ সালে গঠিত হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এ ছাড়া ও শুরু হয় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্য বই প্রদান ইত্যাদি। নারী শিক্ষা বিস্তারের উপরও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসকল সরকারি উদ্যোগের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোও প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক শিক্ষা এবং সাক্ষরতা প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়।

প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশিষ্ট সংগঠন ও নাগরিকবৃন্দের উদ্যোগে ১৯৯৬ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপর ঢাকায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রণীত সুপারিশমালার অন্যতম ছিল শিক্ষার গুণগত মান পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে "এডুকেশন ওয়াচ" প্রকল্পের জন্ম হয়। শিক্ষা বিস্তারে কাজ করছে এমন চার শতাধিক উন্নয়ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যজোট গণসাক্ষরতা অভিযানসহ বিভিন্ন সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত। এডুকেশন ওয়াচের প্রথম রিপোর্ট শিক্ষার অভ্যন্তরীণ দক্ষতাকে মূল প্রতিপাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বোঝার জন্য স্কুল গমনের হার, স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়া, স্কুলে উপস্থিতি, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, স্কুলের ভৌত সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার মান, পাঠ্য পুস্তক বিতরণ, স্কুল কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ ও স্কুল পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ের উপর তথ্য নেয়া হয়।

দেখা গেছে, প্রাথমিক স্তরে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে গমনের গ্রস হার হচ্ছে ১০৭ এবং এই হার খুলনা বিভাগে সর্বোচ্চ (১১৭) এবং মেট্রোপলিটার এলাকাগুলোতে সর্বনিম্ন (১০১)। সবগুলো এলাকাতেই স্কুলে গমনের গ্রস হার ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বেশী। প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের প্রায়

---

*'Hope not complacency: state of primary education in Bangladesh 1999' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সমীর রঞ্জন নাথ। 'রিপোর্টটি ইউনিভার্সিটি প্রেস

এক তৃতীয়াংশই এসেছে ৬-১০ বছরের বাইরে থেকে। দেখা গেছে, প্রাথমিক স্তরের মোট ছেলে-মেয়েদের মাত্র ৮.৫% ছাত্র-ছাত্রী এনজিও পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়ালেখা করে। অন্যদিকে স্কুলে গমনের নিট হার হচ্ছে ৭৭% অর্থাৎ ৬-১০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের ২৩% এখনো স্কুলের বাইরে রয়ে গেছে।

অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে গমনের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেসব অভিভাবকের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল তাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্কুলে গমনের হার বেশী। মুসলমানদের মধ্যে এই হার অমুসলমানদের তুলনায় বেশী। আবার এনজিও কর্মসূচির সঙ্গে মায়েদের সংশ্লিষ্টতা এবং পিতামাতার শিক্ষা ছেলে-মেয়েদের স্কুলে গমনের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন ক্লাসে গড়ে প্রতি বছর চার থেকে সাত শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ছেড়ে চলে যায়। গড়ে ৬২% ছাত্র-ছাত্রী শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকে। এই হার মেয়েদের মধ্যে ৬৪% এবং ছেলেদের মধ্যে ৬১%। শ্রেণীকক্ষে মাত্র ৬৬% ছাত্র-ছাত্রীর বসার মত স্থান রয়েছে। যদিও গড় ধারণ ক্ষমতার তুলনার অনেক বেশী ছাত্র-ছাত্রীর নাম রেজিস্টার খাতায় রয়েছে। অনুপস্থিতির হার বেশী হওয়ায় তা কোন সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়নি। উপস্থিতির হার সরকারি স্কুলে অনেক কম (৫৮%) এবং উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে অনেক বেশি (৮১%)।

পড়তে ও লিখতে পারা, অংক কষতে পারা এবং সাধারণ জীবন দক্ষতার জ্ঞান এই চারটি বিষয় মিলিয়ে মৌলিক শিক্ষার ন্যূনতম স্তর স্থির করা হয়েছিল। দেখা যায়, মৌলিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে শহরের ছেলে-মেয়েরা গ্রামের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় অনেক ভাল করেছে। খুলনার ছেলে-মেয়েরা সবচেয়ে ভাল করেছে (৩৮%) এবং এ হার চট্টগ্রামে সবচেয়ে কম (১৭%)।

দেখা গেছে, ৪২.৫% ছেলে-মেয়ে সাক্ষরতার ন্যূনতম মান অর্জন করতে পেরেছে। যেসব ছেলে-মেয়ে বর্তমানে স্কুলে যাচ্ছে, তাদের মৌলিক শিক্ষার স্তর (৩৪%) যারা ঝরে পড়েছে তাদের তুলনায় অনেক বেশি (১৬.৫%)।

লিমিটেড (ইউপিএল) ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে ১৯৯৯ এ পুস্তক আকারে প্রকাশ করে।

প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পাবার কথা। দেখা গেছে, এক তৃতীয়াংশ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রথম মাসে পাঠ্যপুস্তক পেয়েছে এবং ৭৫% ছাত্র-ছাত্রী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে পেয়েছে। প্রায় অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী বলেছে যে, বই নেয়ার সময় তাদের টাকা-পয়সা দিতে হয়েছিল।

স্কুলে শিক্ষার পাশাপাশি গৃহশিক্ষক রেখে কিংবা প্রাইভেট টিউটর এর বাড়ীতে গিয়ে পড়াশোনা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রাথমিক স্তরের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীর গৃহশিক্ষক ছিল। গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহর এলাকায় গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়ার প্রবণতা অনেক বেশি।

প্রায় ৪০% সরকারি প্রাথমিক স্কুলে তিন অথবা তার চেয়ে কম সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন। সরকারিসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষকদের গড়ে ১২ বছরের শিক্ষা রয়েছে। অন্যদিকে এনজিও পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ যোগ্যতা গড়ে ১০ বছর। শিক্ষকদের স্কুলে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। সর্বোচ্চ অনুপস্থিতি পাওয়া গেছে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, যেখানে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষককে তথ্য সংগ্রহের দিন অনুপস্থিত পাওয়া গেছে।

শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত বিভিন্ন ধরনের স্কুলে বিভিন্ন রকম। সরকারি প্রাথমিক স্কুলে প্রতি ৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন। মাত্র ১২.৯% স্কুলে ৪০ বা তার কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন। উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত সন্তোষজনক।

সরকারি প্রাথমিক স্কুলে গড়ে প্রতিটিতে প্রায় ৪টি কক্ষ রয়েছে, তবে তা গ্রামীণ এলাকায় আরো কম (৩.৪টি)। অন্যদিকে বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলে গড়ে তিনটি কক্ষ এবং উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে মাত্র একটি কক্ষ রয়েছে। এক তৃতীয়াংশ স্কুলের ভবন পাকা।

নব্বই শতাংশেরও বেশী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে কোন কোন স্কুলের নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে আবার কোন স্কুলে পার্শ্ববতী কোন বাড়ী বা প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা করা

হয়েছে। জরিপভুক্ত অর্ধেক স্কুলের নিজস্ব খেলার মাঠ রয়েছে এবং খুব কম সংখ্যক এনজিও স্কুল অথবা কিন্ডারগার্টেনে এই সুযোগ রয়েছে।

স্কুলের সঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রায় সবগুলো সরকারি এবং বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল এবং মাদ্রাসায় স্কুল ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠিত হয়েছে। প্রতিটি পরিষদে গড়ে দশ জন করে সদস্য রয়েছেন যার মধ্যে মাত্র দুই জন মহিলা। স্কুল ব্যবস্থাপনা পরিষদে মহিলাদের অংশগ্রহণ এনজিও স্কুলে সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৫৭%) আর মাদ্রাসায় সবচেয়ে কম (মাত্র ০.২%)। ১৯৯৮ সালের প্রথম দশ মাসে প্রতি স্কুলে গড়ে আটটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে গড়ে প্রতি সভায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রাথমিক স্কুলে অধ্যয়নরত ৩১.৮% ছাত্র-ছাত্রীর পিতা-মাতা কিংবা অন্য অভিভাবক গত এক বছরে কমপক্ষে একবার স্কুল আয়োজিত সভায় অংশ নিয়েছিলেন। এ ধরনের অংশগ্রহণের হার শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি। দেখা যায়, উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের স্কুল সভায় যোগদানের হার সবচেয়ে বেশি (৬৪.৭%) এবং আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি স্কুলের অভিভাবকদের ক্ষেত্রে এই হার সবচেয়ে কম (১৩.৫%)।

থানা শিক্ষা অফিসার এবং তার সহকারি মিলিতভাবে আনুষ্ঠানিক স্কুল পরিদর্শন করার কথা। দেখা গেছে যে, সরকারি স্কুলের (৪৭%) তুলনায় উপ-আনুষ্ঠানিক (প্রায় ৩১%) স্কুল গড়ে পরিদর্শন বেশি করা হয়েছে। এই পরিদর্শন করেছেন থানা শিক্ষা অফিসার। আবার সহকারি থানা শিক্ষা অফিসার বেশি সংখ্যক স্কুল পরিদর্শন করেছেন। বাংলাদেশ তার মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিএনপি) মাত্র ২.৩% শিক্ষা খাতে খরচ করে অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এই হার ৩.৮%। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ এখনো অপ্রতুল। বরাদ্দ টাকার ৯০% খরচ হয় শিক্ষকদের বেতন, ভাতা এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ। ফলে স্কুল পরিরদর্শন ও তত্ত্বাবধান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পাঠক্রমের মানোন্নয়নের জন্য খুব কমই অবশিষ্ট থাকে।

বিবাহ, জন্মনিরোধ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব: একটি সমীক্ষা*

এফ এম কামাল ও আবদুলাহেল হাদী

শিক্ষা মানুষের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা মানুষের আচরণ, বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান দক্ষতার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। শুধু বিদ্যালয় কেন্দ্রিক নির্দিষ্ট কতগুলো নির্বাচিত বইয়েই শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয় বরং এর সাথে জড়িত শিক্ষার পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এবং শিক্ষা অনুষঙ্গী কার্যক্রম ইত্যাদি। এ বিষয়গুলোর সমন্বিত একটি রূপই হল শিক্ষা। শিক্ষা মহিলাদের জীবনে কতগুলো নির্দিষ্ট ক্ষেত্র যেমন, বিবাহ, জন্মনিরোধক ব্যবহার ও স্বাস্থ্যে কী কী প্রভাব ফেলেছে তা দেখার জন্য ১৯৯৭ এর শেষের দিকে একটি সমীক্ষা হাতে নেয়া হয়। এই সমীক্ষার জন্য ১৯৯৫ সালে সংগৃহীত 'ওয়াচ' প্রকল্পের তথ্য ব্যবহার করা হয়। 'ওয়াচ' ব্র্যাকের একটি নিরীক্ষা পদ্ধতি (Surveillance system)। দশটি জেলার ৭০টি গ্রামে এ প্রকল্প রয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে দরিদ্র মানুষের সামাজিক জীবনে কী কী পরিবর্তন এসেছে তা দেখার জন্য 'ওয়াচ' প্রকল্পের সূত্রপাত হয়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষক কিংবা শিক্ষা উপকরণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার এই দৈন্যতা পূরণের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পালন করছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা। এ জন্য ব্র্যাক ১৯৮৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ২২টি স্কুল চালু করে। বর্তমানে ব্র্যাক প্রায় ৩৪ হাজার উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করছে। ব্র্যাক স্কুলের কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এই স্কুলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, সঠিক বয়সে বিয়ে হওয়ার ক্ষেত্রে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ইতবাচক প্রভাব রয়েছে। তবে জমির মালিকানা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা ধর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলোরও প্রভাব রয়েছে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উত্তীর্ণদের একটি বিরাট অংশ (প্রায় ২৭%) বিয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ও আইনানুগ বয়স

---

*'Impact of non-formal primary education age, contraception and health skill: evidence from BRAC villages' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (ডিসেম্বর ১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উলাহ্।

মেনে চলেছে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যা প্রায় ১৯%। যারা নিরক্ষর তাদের মধ্যে এ হার প্রায় ১১%। দেখা গেছে, যারা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্যে সঠিক বয়সে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। জমির মালিকানা ও ধর্ম সঠিক বয়সে বিয়ে হওয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোন তাৎপর্য বহন করে না।

আবার দেখা গেছে, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে জন্ম-নিরোধক ব্যবহারের হার অত্যন্ত কম (৩০%)। এমনকি এ হার নিরক্ষরদের চেয়েও কম। অথচ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উত্তীর্ণদের ৪৫% জন্মনিরোধক ব্যবহার করে থাকে। নিরক্ষরদের মধ্যে এ হার প্রায় ৪০%। জন্মনিরোধক ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার তেমন কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।

প্রায় ১২% মহিলা যাদের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে তাদের পার্শ্ববতী টিকাদান কেন্দ্র সম্পর্কে ধারণা। রয়েছে। আবার যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ হার প্রায় ১০%। আবার যারা নিরক্ষর তাদেরও প্রায় ১৩% টিকাদান কেন্দ্র সম্পর্কে ধারণা রাখে।

টিকাদানের উপকারিতা কী এ বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উত্তীর্ণদের মধ্যে বেশী। এক্ষেত্রে নিরক্ষরদের মধ্যে এ হার সর্বনিম্মে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উত্তীর্ণদের মধ্যে এ হার নিরক্ষরদের তুলনায় বেশি। চিন্তা, চেতনা ও সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে যার প্রমাণ মিলেছে এই সমীক্ষায় যেমন, পানি বিশুদ্ধকরণ বিষয়ে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে সচেতনতা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। এ হার অন্য দু'টি গ্রুপ অথ্যাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ও নিরক্ষরদের তুলনায় অনেক ভাল।

আরো দেখা গেছে যে, রাতকানা রোগের কারণ সম্পর্কে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উত্তীর্ণদের (৯৬%) ধারণা বেশি ভাল। যারা নিরক্ষর তাদের মাত্র ৪৫% এ রোগের কারণ সম্পর্কে ধারণা রাখে। আবার দেখা গেছে, যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছে তাদের অধিকাংশই (৮১%) রাতকানা রোগের কারণ সম্পর্কে ধারণা রাখে।

উন্নয়নের মূল চাবি হল শিক্ষা। অথচ আজ বাংলাদেশে শিক্ষার দৈন্যদশা। ‘সবার জন্য শিক্ষা’ এই শ্লোগান বাস্তবায়নের কোন কর্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার অত্যন্ত কম। পল্লী অঞ্চলে এ হার আরো কম, এবং নারীদের ক্ষেত্রে এ চিত্র আরো করুণ।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার তেমন কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়না। তার পরেও এই যে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কারণে সঠিক বয়সে বিয়ে হওয়া বা করার প্রবণতা সকলের মাঝে দেখা যায়, তা নিশ্চয়ই উল্লেখ করার মত।

আয়-উৎপাদনশীল সম্পদের উপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণঃ ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচির ভূমিকা*

সামিহা হুদা ও সিমিন মাহমুদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে উন্নয়ন সংস্থাগুলোর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, মহিলাদের ক্ষমতায়নে ঋণ কর্মসূচির বেশি ভুমিকা রয়েছে। ব্র্যাক ও আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি) যৌথভাবে ১৯৯৫ সালে মতলব থানায় এক সমীক্ষা পরিচালনা করে। উদ্দেশ্য ছিল সম্পদের উপর মহিলাদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচি কোন প্রভাব বিস্তার করছে কিনা তা দেখা।

মতলব থানার আইসিডিডিআর,বি সমীক্ষা এলাকার ৬০টি গ্রাম থেকে ১৪টি গ্রাম বেছে নেয়া হয় এ সমীক্ষার জন্য। এই ১৪টি গ্রামের ১০টি গ্রাম থেকে প্রতিটি থানা এবং বাকী চারটি গ্রামের শুধুমাত্র ব্র্যাক সদস্য হবার যোগ্য খানাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ গবেষণার জন্য তথ্য নেয়া হয় ১৫-৫৫ বছর বয়স্ক বিবাহিত মহিলাদের কাছ থেকে। সঞ্চয় ও ঋণ, আয়-উপার্জনে তাদের অংশগ্রহণ, শিশু প্রতিপালন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা, সম্পদের মালিকানা, মায়ের বাড়ির সাথে সম্পর্ক, ক্রয় কারার সিদ্ধান্তে ও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ, জন্মশীলতা, জন্মদান ইত্যাদি বিষয়সমূহ গবেষণার জন্য বিবেচনায় নেয়া হয়। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারছেনা। কৃষিখাতে বিদ্যমান উদ্বৃত্ত শ্রম অন্য কোনো খাতে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পুঁজি। এই জনগোষ্ঠিকে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পুঁজির যোগান দিচ্ছে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি)। ঋণ সুবিধা প্রদান ও এই ঋণের কার্যকর ব্যবহারে জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্র্যাকের সদস্যদেরকে (যাদের শতকারা ৯৩ জন মহিলা) স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে। দেখা গেছে যে, ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচি গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করছে।

---

*'Women's control over productive assets: role of credit-based development interventions' শীর্ষক গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সাইফ উদ্দিন আহমেদ।

সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, ব্র্যাকের বেশিরভাগ সদস্য (৫৯%) শুধুমাত্র ঋণ সুবিধা পেয়েছে। তবে এক-চতুর্থাংশের বেশি সদস্য (২৮%) প্রশিক্ষণ ও ঋণ উভয় সুবিধাই পেয়েছে। প্রায় ১৩% সদস্য উভয় প্রকার সুবিধা হতে বঞ্চিত ছিল। উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত বেশিরভাগ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য মহিলাদের ক্ষমতায়ন। ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও আয়-উৎপাদনশীল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের একটা হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে মহিলাদের সামাজিক মান-মর্যাদা, সম্পদের উপর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ খুব বেশি নয়। মহিলাদের ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ ও পরিবারের আয়ে তার অবদান পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। সার্বিক বিবেচনায় আয়-উৎপাদনশীল সম্পদের উপর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসাবে ধরা যায়।

গ্রাম সংগঠনের সদস্যপদ পরিবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সম্পদের উপর অধিকার অর্জন ও সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। তবে এই সদস্যপদ ছাড়াও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও পারিবারিক পটভূমি তাদের সামাজিক পদমর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। দেখা গেছে যে, সদস্যপদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে মহিলাদের বড় সম্পদের উপর অধিকার বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের শিক্ষা কিংবা তাদের পেশা অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিতে তেমন কোন ভূমিকা রাখেনা। তবে শুধুমাত্র আরডিপি সদস্যপদ বিবেচনা করলে বড় সম্পদের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণে সদস্যরা অসদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি ভাল অবস্থানে আছে। নূতন বিবাহিতাদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে বড় সম্পদের উপর তাদের ভাল নিয়ন্ত্রণ থাকে। তবে বড় সম্পদের উপর অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে কর্তার পেশা বা দীর্ঘ সদস্যপদের তেমন কার্যকরী কোন প্রভাব নেই। শুধুমাত্র ব্র্যাক ঋণ সুবিধাভোগী সদস্যরা ঋণ সুবিধা বঞ্চিত সদস্য বা ঋণ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের তুলনায় বড় সম্পদের মালিক বেশি হয়েছে। দেখা যায়, আরডিপিভুক্ত এলাকার অসদস্য মহিলারা এলাকা বহির্ভূত অসদস্যদের চেয়ে বেশি সম্পদের অধিকারী হয়েছে।

ব্র্যাক দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি হতে নিয়েছে। সদস্য হিসাবে মহিলারা ব্র্যাকের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে সামাজিক ও পারিবারিক কার্যক্রমে আরও বেশি কার্যকরী অবদান

রাখতে সক্ষম। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে মহিলাদের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। দেখা গেছে মহিলারা আয়-উপার্জনকারী বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত হতে উৎসাহিত হয়।

ব্র্যাকে অংশগ্রহণের ফলে মহিলারা বিভিন্ন বিষয়ে দলগত আলোচনা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে যা তাদের আত্মবিশ্বাস অর্জনে সহায়তা করে। এই প্রভাব সদস্যপদের মেয়াদ ও ব্র্যাকের সহযোগিতার উপরও নির্ভরশীল। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির দ্বারা নারীদের জীবনে কোন বড় ধরনের উন্নয়ন আশা করার জন্য চার বছর খুবই সংক্ষিপ্ত সময়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের উপর সহিংসতা*

আবদুলাহেল হাদী

বাংলাদেশে গ্রামীণ মহিলাদের উপর সহিংসতা নতুন কোন বিষয় নয়। বহু বছর ধরে চলে আসছে মহিলাদের উপর বিভিন্ন ধরণের মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন। আর এ নির্যাতন বিশেষ করে স্বামীরাই তাদের স্ত্রীদের উপর চালিয়ে থাকেন। নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি হতে নিয়েছে। প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কি করে নারীদেরকে এই নির্মমতা থেকে মুক্তি দেয়া যায়।

বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা নির্যাতিত দরিদ্র মহিলাদের নানাভাবে সাহায্য করে আসছে। মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রচলিত বিশেষ কিছু আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্নভাবে কাজ করছে। এছাড়াও নিজস্ব উপার্জন দিয়ে পরিবারকে সাহায্যের জন্য ঋণ দানের মাধ্যমে সমাজে তাদেরকে জড়িত করছে বিভিন্ন উন্নয়মূলক কাজে। যাতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পরিবারে তাদের অরক্ষিত অবস্থান থেকে কিছুটা রক্ষা করা যায়। ব্র্যাকও এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে, যার মধ্যে ঋণদান কর্মসূচি অন্যতম। মহিলাদের সনাতন অবস্থানকে বদলে দিতে এ সকল কর্মকান্ড অগ্রণী ভুমিকা রাখছে। ঋণদান কর্মসূচি গ্রামীণ এলাকায় নারী নির্যাতন কিভাবে হ্রাস করছে তা দেখা হয়েছে এ সমীক্ষায়।

এ গবেষণার জন্য ৭০টি গ্রামের মহিলা যাদের বয়স পঞ্চাশের বেশী তাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি গ্রামের পঞ্চাশ জন বিবাহিত মহিলাকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৯৬-এর মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে ৫০০ জন মহিলার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সাধারাণতঃ স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের নিপীড়ন তাদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়। এই নিপীড়ন তিন ধরনের হয়ে থাকে- শারীরিক, মানসিক এবং মৌখিক। প্রত্যেক পাঁচ জনের মধ্যে একজন মহিলা অভিযোগ করেছেন যে স্বামীরা তাদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে। এছাড়াও সন্তান ও

---

*'Household violence against women in rural Bangladesh' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (মার্চ ১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন জাবীন মোহসীন সংগীতা।

প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে বউকে গালিগালাজ করা ও অসম্মানজনক উক্তি উচ্চারণ করা খুবই সাধারণ ঘটনা। মানসিক নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে স্বামী কর্তৃক তুচ্ছ কারণে প্রহার করার হুমকি, তালাক দেয়ার হুমকি এবং যৌতুকের জন্য চাপ প্রদান ইত্যাদি। অল্প বয়সীদের চেয়ে বয়স্ক মহিলারা নির্যাতনের শিকার কম হন। ধরে নেয়া হয় এদের স্বামীরা বয়সের সাথে সাথে নিস্তেজ এবং মানসিকভাবে কিছুটা শান্ত হয়ে পড়ে; আবার বয়স্ক মহিলাদের সন্তান বড় হয়ে গেলে তাদের আত্মসম্মান বাড়ে বিধায় তাদের উপর নিপীড়ন কিছুটা কমে আসে। অনেক সময় যে কোন সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্যাতন শুরু হয়।

শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নির্যাতনের ঘটনা কম দেখা যায়। সহিংসতা হ্রাসে শিক্ষার একটি ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। আবার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যে নির্যাতনের হার বেশি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ক্ষুদ্রতর ধর্মীয় গোষ্ঠী। এ জন্য হয়তো তারা নিজেদের মধ্যে এ জাতীয় সমস্যা সৃষ্টি করতে চায় না। উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে এরকম মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক নির্যাতন কম হতে দেখা গেছে। মহিলারা নিজেরা উপার্জন করলে স্বামীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, পুত্র সন্তান জন্ম না দেয়ায় ৫ জন, যৌতুক দিতে না পারায় ৮ জন, রান্নায় দেরি করায় প্রায় ৪৫ জন, তুচ্ছ ভুলের জন্য ৭৫ জন এবং কারণ জানা যায়নি এমন ৪২ জন মহিলা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সমাজে মহিলারা কতখানি অসহায় ও অমানবিক জীবন যাপন করছে। অন্যদিকে মহিলাদের একটি বড় অংশ মনে করে যে স্বামীরা তাদেরকে শাসন ও মারার অধিকার রাখে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে আইনের সহযোগিতা নিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং নির্যাতনকারীদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে তাও তারা জানে না।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নির্যাতনের এই হার অপেক্ষাকৃত বেশি। আর এ জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে বরাবরই দায়ী করা হয়। শিক্ষা ও দারিদ্র্যের সাথে নির্যাতনের এই সম্পর্ক গভীর। মহিলাদেরকে ঋণদানের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন আনা সম্ভব।

ব্র্যাক সেন্টারের আশেপাশে মহাখালীর বস্তিবাসীঃ একটি সমীক্ষা*

সোহেলা হক খান, আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী ও ফজলুল করিম

ব্র্যাক এযাবৎকাল কেবল গ্রামীণ উন্নয়নের দিকে বেশী জোর দিয়ে এসেছে। সম্প্রতি গ্রামোন্নয়নের পাশাপাশি ব্র্যাক নগর উন্নয়নের জন্য বিবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। নগর উন্নয়ন কর্মসূচির নাম হচ্ছে ব্র্যাক আরবান প্রোগ্রাম (BUP) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের বিভিন্ন বিষয়ে সেরা প্রদান করা। এই কর্মসূচিকে একটি কার্যকরী উন্নয়ন কৌশলে পরিণত করার জন্য প্রাথমিকভাবে পদক্ষেপ নেয়ার পরিল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনার কথা মনে রেখে ব্র্যাকের গবেষণাও মূল্যায়ন বিভাগ এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করে। উদ্দেশ্য ছিল বস্তিবাসীদের জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিক খুঁজে দেখা, যেমন ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক বিষয়-সমূহ।

ঢাকার মহাখালীতে ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয়ের চারদিকে রয়েছে অনেক বস্তি যেমন, টিবি গেট তালতলা, সাততলা, কড়াইল, আগাখানা পট্টি, ওয়াসা পট্টি ইত্যাদি। এই সকল বস্তির অধিবাসিদের সাথে খোলামেলা আলাপ করে এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বস্তিগুলোকে ছোট-বড় উত্তর এবং দক্ষিণ এভাবে সুস্পষ্টভাবে ভাগ করা যায়। ছোট বস্তিগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয় থাকা, খাওয়া ও ঘুমানোর জন্য। এছাড়া বড় বড় বস্তিগুলোতে আছে দোকান, বাজার, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, খেলার মাঠ এমনকি কবরস্থানও। ছোট বস্তিগুলোর ঘরের অবস্থা বড় বস্তিগুলোর তুলনায় বেশি করুণ। যেমন, ছোট বস্তি গুলোর ঘর চাটাই, ছালা, পলিথিন ইত্যাদি দিয়ে তৈরী আর বড় বস্তির ঘর বাঁশের বেড়া এবং টিনের চাল দিয়ে। তবে সব বস্তির ঘরের মেঝে ছিল মাটির। ছোট ছোট বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও বড় বস্তিবাসীদের তুলনায় খারাপ। এসব বস্তিতে একসাথে অনেক লোক বাস করে এবং এগুলো খুবই নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। বস্তিগুলোতে মেট্রোপলিটন শহরের ন্যূনতম সুবিধা নেই। বস্তিগুলো ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন হওয়া সত্ত্বেও সেখানে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বড় অভাব। যদিও কিছু কিছু বস্তিতে বস্তিবাসীরা অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা করে নিয়েছে। শহরের বেশিরভাগ বস্তি গড়ে উঠেছে অবৈধভাবে এবং সেজন্য তাদের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় আছে। অর্থাৎ যখন তখন উচ্ছেদের সম্ভাবনা

---

*'Beneath the shadows of BRAC Centre: slums of Mohakhali' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন নুরজাহান আক্তার সেতু।

থাকা সত্ত্বেও বস্তিবাসীদের মধ্যে এ নিয়ে খুব একটা সংশয় নেই। যেহেতু তারা বিভিন্ন মহল থেকে প্রায়ই বস্তি উচ্ছেদের হুমকি পেয়ে থাকে।

বস্তিবাসীরা বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড করে থাকে। বস্তির বয়স্ক এবং শিশু সকলেই অশিক্ষিত তবে বয়স্করা চায় যে তাদের শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। বস্তিগুলোতে কিছু কিছু এনজিও স্কুল চালু করেছে, যেমন ব্র্যাক ও গণসাহায্য সংস্থা। এছাড়াও কিছু বস্তিতে উন্নয়ন সংস্থা ঋণদান বর্মসূচি চালু করেছে। প্রশিকা কয়েকটি বস্তিতে ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে এবং আন্তর্জাতিক কিছু স্বাস্থ্য কর্মসূচি চালু করেছে।

বস্তিবাসীরা গবেষকদের কাছে তথ্য সংগ্রহের সময় তাদের বিভিন্ন অভাব এবং চাহিদার কথা জানায়। যেমন ক্ষুদ্র ঋণ, নিরাপদ খাওয়ার পানি, বাচ্চাদের স্কুল, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, ভাল স্বাস্থ্য সেবা এবং স্থায়ী বাসস্থানের নিশ্চয়তা। তবে বস্তিবাসীরা ব্র্যাককে ঋণ প্রদানের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেয়। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা নির্বাচন করার সময় (ঋণ গ্রহীতা স্থায়ী না অস্থায়ী বস্তি বাসী) এবং ঋণের পরিমাণের ব্যাপারে বড় অংকের ঋণ যেন না দেয়া হয় এ বিষয়ে তারা পরামর্শ দেয়।

এ গবেষণা থেকে আরো জানা যায় যে, ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয় বা ব্র্যাক সেন্টারের আশেপাশের বস্তিলোতে ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রমের বেশ চাহিদা আছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি পরামর্শ হলো এনজিও কর্মসূচির লোকজন যেন বস্তিবাসীদের মতামত জেনে শুনেই অগ্রসর হয়। অবশেষে যখন বস্তিবাসীদের জিজ্ঞেস করা হলো, কারা এসব বস্তিতে থাকে? তারা উত্তর দিল, "গ্রামের দরিদ্রই শহরের বস্তি"।

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠির উপর ব্র্যাকের পলী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব*

মাসুমা খাতুন, এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার, আব্বাস ভুইয়া ও আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা পাশাপাশি বিদ্যমান। বিশ্ব ব্যাংকের একটি হিসেবে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার শতকরা ৪০ ভাগ দরিদ্র জনগণের আয় দিনে এক ডলারেরও কম। ক্যালরী গ্রহণ অনুযায়ী একটি হিসেবে দেখা গেছে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫-৫১ ভাগ দরিদ্র। গ্রামের দরিদ্র মানুষের মধ্যে কম ক্যালরী গ্রহণের হার আরো বেশি। গ্রামীণ অশিক্ষিত বেকার এবং ভূমিহীন দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য ঋণ দানের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ভূমিকা অপরিসীম।

গ্রামীণ দরিদ্রদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত করার জন্য ব্র্যাক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হতে নিয়েছে যেমন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ঋণ, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি। এই পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্র্যাক সদস্য এবং অসদস্যদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সঠিক ক্যালরী গ্রহণের মাত্রা সম্পর্কে জানা। ১৯৯৫ সালে মতলব থানার ১৪টি গ্রামে ২,০৬১টি খানার ক্যালরী গ্রহণের উপর এই পর্যবেক্ষণ করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ব্র্যাকের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের ক্যালরী গ্রহণের মাত্রা ১,৯৯৭ কিলোক্যালরী যা ৯৫-৯৬ এর জাতীয় পর্যবেক্ষণের সর্বশেষ মাত্র ১,৯০০ কিলোক্যালরীর তুলনায় সামান্য বেশি। ব্র্যাক সদস্য, লক্ষিত কিন্তু সদস্য নয় এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠী নয় এদের দৈনিক জনপ্রতি ক্যালরী গ্রহণের মাত্র যথাক্রমে ২,০১৪; ১,৮৫২; এবং ২,১৫৩ কিলোক্যালরী। সরকারি হিসাবে একজন ব্যক্তির দৈনিক খাদ্য গ্রহণে ক্যালরীর পরিমাণ ২,৩১০ কিলোক্যালরী হওয়া উচিত। মতলব থানায় মোট জনগোষ্ঠীর শুধুমাত্র ২৫% ছাড়া এই নির্ধারিত মাত্রা কেউ গ্রহণ করতে পারেনি। ব্র্যাক সদস্য খানায়

*'Effect of BRAC's rural develoment programme on calorie consumption: evidence from Matlab' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন জাবীন মোহসীন সংগীতা।

২০% এই মাত্রা পূরণ করেছে। দেখা যায়, অসদস্যদের ৩২% নির্ধারিত হারে অর্থাৎ ২,৩১০ কিলোক্যালরী গ্রহণ করতে পারে।

ক্যলরী গ্রহণের হার পরিবারের আকার, খানা প্রধানের শিক্ষা ও আয়ের উপর নির্ভর করে। এছাড়া মাসে খাদ্য বাবদ খরচ এবং খানার নিজস্ব জমির সাথেও ক্যালরী গ্রহণের সম্পর্ক রয়েছে। পরিবারের আকার ছোট হলে সদস্যরা খাদ্য বেশি পায়, ফলে ক্যালরী গ্রহণের হারও বেশি হয়। সুতরাং খানা প্রধানের শিক্ষাও এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখে। শিক্ষিত খানা প্রধানের ক্যালরী গ্রহণের হার অশিক্ষিত খানা প্রধানের চেয়ে বেশি।

খানা প্রধানের আয় অনুযায়ী একটি পরিবারের সামাজিক অবস্থা কেমন হবে তা নির্ভর করে। দিনমজুর দিনে ১,৮০৫ কিলোক্যালরী খাদ্য গ্রহণ করে। যারা জমিতে কাজ করে তাদের ক্যালরী গ্রহণের হার ন্যূনতম। দিনমজুরদের ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ বাসা-বাড়ীতে যারা কাজ করে তারা যে পরিমাণ ক্যালরী গ্রহণ করে তার চেয়েও কম। মাসে যাদের খাদ্য বাবদ বরাদ্দ ১,০০০ টাকার কম এবং বছরে ভোগের জন্য ৪,০০০ টাকার কম তাদের মধ্যে ক্যালরী গ্রহণ সবচেয়ে কম। আর যাদের খাদ্য এবং ভোগের জন্য বরাদ্দ ২,০০০ এবং ৮,০০০ টাকা তাদের মধ্যে ক্যালরী গ্রহণের হার একটু বেশি। গ্রামীণ এলাকার জমির মালিকানাও সামাজিক অবস্থার নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া ও জমির পরিমাণের উপর ও ক্যালরী গ্রহণের মান নির্ভর করে। কিন্তু মোটামুটি সবক্ষেত্রেই আর্থ-সামাজিক অবস্থান একই থাকলেও ব্র্যাক সদস্যরা অসদস্যদের চেয়ে বেশি ক্যালরী গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার অত্যন্ত কম এবং গ্রামে আরো কম। সাধারণত দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে দিনমজুরীর ও অন্যান্য কাজ করে বিধায় স্কুলে গেলেও কিছু দিনের মধ্যে ঝরে পড়ে। দেখা যায়, স্কুলে যায় এমন শতকরা ৮০টি বাচ্চা ছোট কৃষক পরিবার থেকে আসে।

কৃষি কাজই দরিদ্র জনগোষ্ঠির একমাত্র পেশা। তবে এ পেশাও নানা রকম সমস্যায় বিজরিত যেমন, ভুমিহীন কৃষক, কম উৎপাদন, ইত্যাদি। দরিদ্র জনসাধারাণ সারা বছর ঠিকমত কাজও পায় না। বিভিন্ন পেশার লোকদের ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়। এভাবে দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা বেড়ে যায়।

এদের কাজে দক্ষতা না থাকায় কোনভাবেই আয় বাড়াতে পারে না, আর সে কারণেই এরা থেকে যায় দরিদ্র।

আশা করা যাচ্ছে যে, ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ-কারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। এই পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে অংশগ্রহণ-কারীদের ক্যালরী গ্রহণের মাত্রার কি পরিবর্তন এসেছে তা জানা। এতে দেখা গেছে, ব্র্যাকের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্যালরী গ্রহণের হার বেশি। ব্র্যাক সদস্যদের মধ্যে ক্যালরী গ্রহণের হার বেশি এটি একটি আশার দিক। তবুও জাতীয় ক্যালরী গ্রহণের নির্ধারিত পরিমাণ থেকে এই হার অনেক কম। প্রকৃত দরিদ্রদের চিহ্নিত করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টার মাধ্যমে দৈনিক নির্ধারিত ২,৩১০ কিলোক্যালরী নিশ্চিত করা একান্ত জরুরী।

খাদ্য সাহায্য ও টেকসই উন্নয়ন: ক্ষুধা নিবারণে ব্র্যাকের ভূমিকা*

মু. গোলাম সাত্তার, নুসরাত সাবিনা চৌধুরী ও মো. আলতাফ হোসেন

খাদ্যের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। অথচ বিশ্বের ৮০ কোটি মানুষ আজ খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থায় বসবাস করছে। বাংলাদেশেও এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। অর্থাৎ, এ দেশে প্রতি চার জনের মধ্যে একজন মানুষ অনাহারে কিংবা অর্ধাহারে দিন কাটান। সমগ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে মা ও শিশুরাই ক্ষুধা ও অপুষ্টির প্রধান শিকার। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রধান কারণ হল দারিদ্র্য। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আজ সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তৎপর। এ সকল উন্নয়ন সংস্থা গৃহীত বহু রকমের উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির ফলে অনেকেই আজ দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করতে পেরেছেন। তবে দরিদ্রদের মাঝেও যারা অতি দরিদ্র তারা অনেকেই এসব কর্মসূচির সুফল ভোগ করতে পারছেন না। এজন্যই এখন প্রয়োজন তাদের ক্ষুধামুক্তির উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কৌশল ও কর্মসূচি উদ্ভাবন এবং তা গ্রহণ করা।

ব্র্যাক এ লক্ষ্যে উদ্ভাবনী চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে গবেষণাটিতে আইজিভিজিডি (IGVGD) ও কৃষি বনায়ন (Agroforestry) নামে এই দুই ধরনের কর্মসূচির উপর আলোকপাত করা হয়। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্র্যাক আইজিভিজিডি কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের মিলিত প্রচেষ্টায় দুঃস্থ মহিলাদের ভিজিডি কার্ড সরবরাহ করা হয়, যার মাধ্যমে তারা দেড় বছর ধরে প্রতি মাসে ৩০ কেজি হারে গম পেয়ে থাকেন। ব্র্যাক এই কর্মসূচির সাথে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করে এই ভিজিডি কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী রূপ দিয়েছে।

আইজিভিজিডির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যে, এর মাধ্যমে দরিদ্রতম মহিলাগোষ্ঠী ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির অংশীদার হতে পারেন। বর্তমানে এই কর্মসূচির অন্তর্গত সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ।

---

* `Food and sustainable livelihoods: BRAC`s innovations against hunger' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন নুসরাত সাবিনা চৌধুরী।

আইজিভিজিডি কর্মকান্ডের উপর পরিচালিত এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল সদস্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কর্মসূচির প্রভাব যাচাই করা। মূলতঃ খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থা থেকে ক্ষুধামুক্তির পক্ষে তাদের উত্তরণ ঘটেছে কিনা তা লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এ জন্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়।

গবেষণায় দেখা যায় যে, অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল মহিলাই আয় বৃদ্ধিমূলক কোন না কোন কাজ হাতে নিয়েছেন। তার ফলে, এই সব পরিবারে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা দিয়ে পরিবারের অনেক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হচ্ছে এবং পরিবারের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল সম্পদের মধ্যে রয়েছে গৃহ, জমি, গরু-ছাগল, মুরগী, রিক্সা, স্যেব ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল ইত্যাদি।

দেখা গেছে, প্রতি মাসে মহিলারা নিয়মিত সঞ্চয় করছেন, পরিবারের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, খাদ্য হিসেবে বেশি সব্জী এবং কেউ কেউ ডিমও খাচ্ছেন। ফলে পুষ্টিহীনতার মাত্রাও কমে আসছে। এ সকল ইতিবাচক দিক থাকা স্বত্বেও বিভিন্ন কারণে কিছু মহিলা আইজিভিজিডি কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কয়েকজন মহিলা জানান যে, বিভিন্ন কারণে তারা কর্মসূচির সুবিধা ভোগ করতে পারছেন না যেমন, নিজের কিংবা স্বামীর অসুস্থতা, সাহায্যকারী লোকের অভাব ইত্যাদি।

লক্ষ্যণীয় যে, এসব মহিলার কর্মসূচি ত্যাগের প্রধান কারণ হচ্ছে শারীরিক অসুস্থতা ও চিকিৎসা ব্যয়। তাছাড়া সাহায্যকারী লোকবল না থাকায় কেউ কেউ আয়বৃদ্ধির প্রকল্প হাতে নিতে পারেন না। তাই দেখা গেছে, ঋণ সহজলভ্য হলেও ঋণের সে টাকা খাটানোর ক্ষমতা এদের অনেকের নেই। তাই অতি দরিদ্রদের জন্য কোন কর্মসূচি তৈরীর সময় এ বিষয়গুলো বিশেষ বিবেচনায় রাখা দরকার।

কৃষি বনায়ন কর্মসূচি ও দারিদ্র্য বিমোচন ব্র্যাকের উদ্ভাবনী কলাকৌশলের আর একটি উদাহরণ। ১৯৯১ সালে মাত্র ১৭ জন চাষীর অংশগ্রহণে যে কর্মসূচির সূচনা, বর্তমানে তা থেকে প্রায় ১৫,২৯৮ জন চাষী সুফল লাভ করছে। দেশের বনসম্পদ রক্ষা, খাদ্য ও কাঠের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কৃষি বনায়ন একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। দেশের বনসম্পদের ক্রমাম্বয় বিনাশ রোধ ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ব্র্যাক গরীব মহিলা চাষীদের মাঝে ১৯৯৭ সাল থেকে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে জমি

বিতরণ শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার জন্য কৃষক যে শ্রম দিয়ে থাকেন, তার ফলশ্রুতিতে ব্র্যাক (ইউরোপীয় কমিশনের সহায়তায়) কৃষকদের মাসিক ৪২৫ টাকা হারে এক বছর আর্থিক সহায়তা ও মহিলা চাষীদের সাহায্য, সব মিলিয়ে কৃষি বনায়ন শুধুমাত্র একটি উদ্ভাবনী পদক্ষেপই নয়, এই দরিদ্র মহিলাদের অবস্থার উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি।

তিন কোটি মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়। শুধু আইজিভিজিডির মত দু'-একটা কর্মসূচির দ্বারা এই বিশাল জনগোষ্ঠির স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এজন্য দরকার একাধিক ও বিভিন্নমূখী কর্মসূচি এবং উদ্ভাবনী কর্মকৌশল। দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচির জন্য সংশিষ্ট সকলেরই বিশেষতঃ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অঙ্গীকার থাকা দরকার। এজন্য জাতীয় এবং স্থানীয়- দুই পর্যায়েই চিন্তা ও প্রচেষ্ঠার সমন্বয় দরকার। উন্নয়নের জন্য দরিদ্র মানুষদের সংগঠিত করা একান্ত দরকার। সমাবেশন ও সংগঠনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন হতে পারে। তবে তাদের সমাবেশন ও সংগঠিত করার কাজে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সক্রিয় সহায়তা দরকার।

জনসংখ্যা কাঠামোর ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা পরিবর্তনে আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের প্রভাবঃ গ্রামীণ বাংলাদেশের একটি সমীক্ষা*

আবদুলাহেল হাদী ও ফিরোজ এম কালাল

আন্তার্জাতিক মাইগ্রেশন বা দেশান্তর কিংবা আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের ধরন বা এর ব্যাপ্তির বেশ পরিবর্তন ঘটেছে ইদানিংকালে। বহু পূর্বে দেশান্তর বা স্থানান্তরের কারণ ছিল এক আর আজকের প্রেক্ষাপট অন্য। তবে উন্নয়নশীল দেশের নীতি দেশের নীতি নির্ধারকগণ বিশ্বাস করেন যে, উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে শ্রমিকদের স্থানান্তর বা দেশ ত্যাগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা দৃঢ় বিশ্বাসী যে, উন্নত দেশে তাদের বাড়তি শ্রমিক রপ্তানী করে নিজ দেশের অর্থনীতি চাংগা করা সম্ভব। আন্ত:রাষ্ট্রীয় আস্থায়ী দেশত্যাগ উভয় দেশের উপর যে প্রভাব ফেলছে তা অস্বীকার করা যায় না। আন্তর্জাতিক স্থানান্তর বিবিধ কারণে হয়ে থাকে যেমন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আবহাওয়ার পরিবর্তন, নিপীড়ন, আর্থিক চাপ, ইত্যাদি বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকা থেকে যারা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন তাদের দেশে রেখে যাওয়া পরিবারের উপর কী ধরনের সামাজিক ও সংস্কৃতিক পরিবর্তন এসেছে তা দেখার জন্য এই সমীক্ষাটি করা হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশ থেকে দেশত্যাগ শুরু হয়েছে। আর এ দেশত্যাগ ছিল মুলত: যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যের পথে যখন অসংখ্য বাংলাদেশী পাড়ি জমিয়েছে এবং এই প্রবাহ যখন বেড়ে যাচ্ছিল তখন বৃটিশ সরকার স্থানান্তর নীতিতে কতিপয় কঠিন শর্ত আরোপ করে যাতে বিদেশী শ্রমিকের অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে ষাটের দশকে কিছু বাংলাদেশী মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি দেশত্যাগের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। বিশেষ করে ১৯৭৪ এর দূর্ভিক্ষের পরে চরম দারিদ্র্য ও বেকারত্বের কারণে তারা দেশ ত্যাগ করে। তবে নব্বইয়ের দশকে দেশত্যাগের মাত্রা হয়েছে বহুমূখী। এখন শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয় জাপান, কোরিয়া, সিংগাপুর, মালয়শিয়াসহ অনেক দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন বহু বাংলাদেশী।

---

*`Demographic and socio-cultural consequences of international migration in rural Bangladesh' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (অক্টোবর ১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এইচ আর তালুকদার।

দেখা গেছে, দেশত্যাগের ফলে গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্বই শুধু হ্রাস পায়নি, এর সাথে জনসংখ্যা কাঠামোতেও একটি পরিবর্তন এসেছে। সমীক্ষা এলাকায় দেখা গেছে, কম বয়সী লোকদের (১৫-২৯) চেয়ে বেশী বয়সীদের (৩০-৪৫) মধ্যে থেকে দেশত্যাগী বেশি ছিলো। যে এলাকা থেকে দেশত্যাগ বেশি হয়েছে সে এলাকায় পুরুষের সংখ্যা দারুণভাবে কম ছিলো। পুরুষ দেশত্যাগ দেশের জনসংখ্যা কাঠোমোর উপর কিছুটা প্রভাব ফেলেছে।

দেখা গেছে, দেশত্যাগীরা তাদের রেখে যাওয়া পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্যই প্রধানত অর্থ পঠায় এবং তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুৎপাদনশীল কর্মকান্ডে খরচ হয়ে যায়। তবে দেশত্যাগী ও তাদের পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিবারের প্রথাগত ধ্যান-ধারণা ও আদর্শে পরিবর্তন আসতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় দেশত্যাগীগণ দু'ভাবে প্রভাব ফেলে। যেমন,

- অর্থ পাঠিয়ে পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছলতা বাড়ানো; এবং
- নতুন ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে এসে প্রথাগত আচরণে পরিবর্তন।

দেশত্যাগ জন্মশীলতায় তেমন কোনো প্রভাব না ফেললেও দেশ ত্যাগীদের সন্তান জন্ম দেয়ার প্রবৃত্তি একটু বেশি ছিলো আর্থাৎ পরিবার থেকে পৃথক থাকার ফলে সন্তান জন্ম দেয়ার বিরতিকাল বৃদ্ধি পায়, আবার দেশে ফিরলেই সন্তাই পাবার আকাংখা বেড়ে যায়। তাই বহুদিনের অনুপস্থিতির ক্ষতি স্বল্পকালের মধ্যেই পুষিয়ে দিতে তারা অনুরাগী হয়ে উঠে।

দেখা গেছে, যে সব পরিবারের সদস্যরা দেশ ত্যাগ করেছে তারা আধুনিক চিকিৎসা বেশি গ্রহণ করতে পারে। বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণের কারণে তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে স্বচ্ছল জীবন যাপনের জন্য অসুখ-বিসুখের বিস্তার ও এদের মধ্যে কম। এসব মিলে দেশত্যাগী পরিবারের মধ্যে মৃত্যু হার ও কমে গেছে।

আর্থিক সংগতির বিষয়টা বিয়ে-সাদী ও অল্প বয়সে বিয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। গ্রামীণ বাংলাদেশে যৌতুকের আদান প্রদান চলে আসছে বহুকাল ধরে। দেশত্যাগীদের যৌতুক দেয়ার ক্ষমতা বেশি থাকলেও

তাদের মধ্যে যৌতুক দেবার প্রবণতা কমেছে। তবে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা তালাকের ঘটনা কিছুটা বেড়েছে।

দেখা গেছে, গ্রামীণ বাংলাদেশে মেয়েদের সাধারণত বাইরে চাকুরী নিতে উৎসাহ দেয়া হয় না। বিদেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা-পয়সা পাঠানো শুরু হলে দেশত্যাগী পরিবারের মেয়েরা চাকুরী ছাড়তে শুরু করে। দেশত্যাগীদের পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে যৌথভাবে মিলেমিশে থাকার সম্ভাবনা বেশি। কারণ একত্রে থাকলে তারা বেশি নিরাপদ মনে করে। তবে বিদেশ থেকে দেশত্যাগী ফিরে আসলে আবার আলাদা বসবাস করতে শুরু করে।

পরিবারের কোন সদস্য বিদেশে থাকে-এই বিষয়টি পরিবারের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করলেও নারীদের মর্যাদা কিংবা খানায় তাদের ভূমিকা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। ধরে নেয়া হয়, এ সকল পরিবারের মেয়েরা পর্দা প্রথা মেনে চলবে না। তবে দেশত্যাগী ফিরে না আসা পর্যন্ত এ কথা অনেকটাই সত্য। দেশে ফিরে আসলে তারা পর্দা প্রথা আবার শুরু করে।

দেখা গেছে, যে পরিবার থেকে কেউ বিদেশে গিয়েছে তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি এবং হাজিরা বেড়েছে। সম্ভবত আন্তঃরাষ্ট্রীয় দেশ ত্যাগের ফলে সাংস্কৃতিক যে বিনিময় হয়েছে তা তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে। এই দেশত্যাগ পরোক্ষভাবে হলে ও শিক্ষা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় দেশত্যাগের কারণে একান্নভুক্ত পরিবারে বসবাস বেড়েছে, বিশেষ করে সন্তান-সন্ততিদের নিরাপত্তার জন্য মেয়েরা একান্নভূক্ত পরিবারে তাদের স্বকীয়তা রক্ষা করে চলেছে। দেশত্যাগীদের মাধ্যমে আসা উন্নত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা আমাদের গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে এবং একটি সুদুর প্রসারী পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থাঃ একটি পর্যলোচনা*

নাসিমা আক্তার

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে জ্বালানি। বিগত বছরগুলোতে খনিজ জ্বালানি অব্যাহতভাবে পোড়ানোর ফলে বিরাট ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই আজ নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি বিশ্বে কৌতুহল ও সচেতনতা সৃষ্টি করেছে।

খনিজ জ্বালানি যেমন তেল ও গ্যাস ব্যবহারের ফলে পুরোটাই খরচ হয়ে যায়। আমরা খুব দ্রুত এ ধরনের অ-নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ করে ফেলছি। বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ অতি নগণ্য। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি ছোট-খাটো কয়লা খনি রয়েছে বটে, কিন্তু তা থেকে স্বল্প-তাপ উৎপাদক পিট এবং পিটজাত কয়লা পাওয়া যায়, এবং এর উত্তোলন খরচও অনেক বেশি। বর্তমানে দেশের শতকরা মাত্র ১৯৯০ সালেও বেশিরভাগ শহরাঞ্চলে শতকরা মাত্র ২.২ ভাগ পরিবার গ্যাস সুবিধা ভোগ করেছিল এবং শতকরা ৩.৯ ভাগ লোক কেরোসিন তেল ব্যবহার করে রান্না-বান্নার কাজ সেরেছে।

বাংলাদেশে মাথাপিছু জ্বালানি ও বিদ্যুত খরচ উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেও একে বারে নীচের সারিতে। ১৯৯০ সালে ও শতকরা ৭৩ ভাগের বেশি লোক খড়কুটা, কাঠ, গোবর ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেছে। যে সকল পলীতে এখনও বিদ্যুত পৌঁছেনি সেখানে অধিক পরিমাণে জ্বালানি সরবরাহ ও তা দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা দরকার। এ জন্য দরকার সম্ভাব্য উৎসের সন্ধান করা। বৈদ্যুতিক গ্রিডের সম্প্রসারণও ব্যায়সাধ্য। জ্বালানি রূপান্তর ব্যবস্থা কেবল গ্রিড সম্প্রসারণের খরচই কমাবে না, পরিবেশও দূষণমুক্ত রাখতে সহায়ক হবে।

বিকল্প শক্তির সম্ভাব্য উৎসের মধ্যে রয়েছে সৌরশক্তি য অফুরন্ত, দূষণমুক্ত এবং সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বাৎসরিক সূর্যতাপ বিকিরণ ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি (প্রতি বর্গমিটারে ১,৫৭৫ থেকে ১,৮৪০ কিলোওয়াট আওয়ার/বর্গ.মি.)। দেখা যাচ্ছে, মোট সৌরতাপের শতকরা ০.০৭ ভাগ

---

*`Alternative energy situation in Bangladesh: a country review' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এইচ আর তালুকদার।

ব্যবহার করলেও দেশের মোট চাহিদার পুরোটাই মেটানো সম্ভব। বর্তমানে আমরা প্রতি বর্গ মিটারে ২০৮ ওয়াটের ও বেশি সৌরশক্তি পাচ্ছি অথচ ব্যবহার হচ্ছে মাত্র ০.১৫ ওয়াট।

বাংলাদেশে কয়েকটি সংস্থা সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণা করছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, গ্রামীণ শক্তি কমিশন ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন স্থানে সৌর ফটোভোল্টেক স্থাপন করছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড নরসিংদিতে সৌর বিদ্যুত সরবরাহের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়। পাঁচ ধরনের ফটোভোল্টেক (PV) থেকে ১,৩৭০ জন গ্রাহকের বাড়িতে বিদ্যুত সরবরাহ করা হচ্ছে। আণবিক শক্তি কমিশণ সৌর ফটোভোল্টেক চালু করে ১৯৮৫ সালে। এই কমিশন কর্তৃক স্থাপিত ফটোাভোল্টেক সর্বোচ্চ ৯,৭৯০ ওয়াট বিদ্যুত উৎপাদনে সক্ষম হলে ও ব্যবস্থাপনা, মেরামত ও অর্থাভাবে তা অকেজো হয়ে আছে।

স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর কক্সবাজের একটি এবং ৪টি পটুয়াখালীতে এই মোট ৫টি ঘুর্ণিঝড় কেন্দ্রে সৌর ফটো-ভোল্টেক (PV) স্থাপন করেছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে গ্রামীণ শক্তি বিভিন্ন জেলার ৬৭টি সৌর সিষ্টেম চালু করেছে, এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরো ৪০০টি ইউনিট স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের জ্বালানি গবেষণা ও সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সায়েন্স সৌর চুলি উন্নয়ন ও বিতরণের ব্যবস্থা নিয়েছে। জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট ২-৩ কেজি ওজনের হালকা,সস্তা এবং সহজে স্থপনযোগ্য একটি চুলি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু এর অসুবিধা হলো সূর্যের চলাচল লক্ষ্য রেখে হাত দিয়ে ঘুরাতে হয় এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে তাড়াতাড়ি প্রতিফলন কমে যায়। পাঁচ জনের একটি পরিবারের উপযোগী ভাত, মাছ-মাংস ও ডাল রান্না করতে প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগে।

খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউট বাঁশ ও পলিথিন শিট দিয়ে ফলমুল, শক্সী ইত্যাদি শুকানোর জন্য একটি ড্রায়ার তৈরী করেছে। এটা এতো সহজ যে, কেবল একটি বাক্সের উপর এক টুকরা স্বচ্ছ শিট বিছিয়ে দিয়েই শুকনো যায়। এছাড়াও পানি গরম করার জন্য এক ধরনের হিটারও তারা তৈরী করেছে।

বহুদিন ধরেই নরায়নযোগ্য শক্তির মধ্যে বায়ু শক্তি আমাদের সবার দৃষ্টি আর্কষণ করে আসছে। বাংলাদেশের উপকুল থেকে বায়ু শক্তির সম্ভাবনার উপর অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে উপকুলবর্তী এলাকার বায়ু শক্তির সম্ভাব্যতা বিষয়ে আরো সঠিক তথ্য সংগ্রহ না হওয়া অবধি এই শক্তির ব্যবহার নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু করা যাচ্ছে না। বৃটিশ সরকারের সহযোগীতায় বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে বায়ু শক্তি সমীক্ষা প্রকল্প চালু করে। তারা উপকুলের ৭টি অঞ্চলের বায়ু শক্তির উপর তথ্য সংগ্রহ ও বিশেøষণ করেছে। উদ্দেশ্য ছিলো বায়ু শক্তি ব্যবহারের কারিগরি ও বিদ্যুত শক্তির মূল্যায়ন করা। এই এলাকাগুলো কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা ও পটুয়াখালীর উপকুলে বিস্তৃত।

আবহাওয়া দফতরের সংগৃহীত তথ্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যালোচনা করে দেখতে পেয়েছে বাংলাদেশের অনেক এলাকাতেই বায়ু শক্তির অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। সেচ কাজের জন্য ব্যবহৃত হাত পাম্প চালানোর জন্য এই বায়ু শক্তি ব্যবহার করা যায়। দেখা গেছে, চট্টগ্রামে বায়ুর যে গতি তাতে বিদ্যুত উৎপাদন ও পাম্প চালনার জন্য একটি পøান্ট স্থাপনও সম্ভব।

বায়ু শক্তির বিপণন বিষয়ে তেমন কোন অনুসন্ধান চালানো হয়নি। সাগর উপকূলে কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে বিদ্যুতের জন্য বায়ু শক্তি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে চিংড়ী চাষ, মৎস্য প্রক্রিয়াজতকরণ ও বরফ কল ইত্যাদি। এ সমস্ত শিল্প বিদ্যুত গ্রিড অঞ্চলের বাহিরে, ফলে বিদ্যুতের জন্য জেনারেটরের উপর নির্ভরশীল এ সকল অঞ্চল অদূর ভবিষ্যতে গ্রীড লাইনের আওতায় আসবে এমন সম্ভাবনাও ক্ষীণ। বায়ু শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুত উৎপাদান ও সরবরাহের জন্য এ অঞ্চল খুবই সম্ভাবনাময়ী।

অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ জৈব জ্বালানী ব্যবহার করে আসছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ কাঠ, খড়, বাঁশ ও বনজ লতাপাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে বন-জংগল প্রায় উজার করে ফেলেছে। এদেশে অতি পরিচিত জৈব পদার্থ থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি হলো কাঠ, কৃষিজ অবশিষ্টাংশ এবং গোবর। কিন্তু লোক বসতি অধিক হারে বাড়ার জন্য বন-বাদাড় এবং কৃষি জমি

হ্রাস পাচ্ছে। পিছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে ১৯৮০-১৯৮১ সালে জৈব শক্তি ৮৩% হারে কমেছে, ১৯৮৯-৯০ এ কমেছে ৭৩% এবং ১৯৯৪-৯৫ এ কমেছে ৬৭%।

জৈব শক্তির বিকল্প প্রযুক্তি হিসেবে জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট একক ও ডবল চুলার জ্বালানি খরচ ৫০-৭০ ভাগ কমিয়ে এনেছে। কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ কাজে নিয়োজিত বায়োগ্যাস জীবজন্তু ও কৃষি আবর্জনা অথবা পচনশীল দ্রব্য থেকে পাওয়া যায়। ১৯৭২ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষামূলকভাবে গ্যাস উৎপাদনের জন্য প্রথম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করে। এ পর্যন্ত দেশে মোট ১,০০০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় একটি মাঝারি পরিবারের উপযোগী প্লান্টের জন্য ৪-৫টি গরুর গোবর দরকার। এ হিসেবে বড়জোর ২০% গ্রামীণ পরিবার এ সুযোগ থেকে লাভবান হতে পারবে।

সম্প্রতি সরকার 'বায়োগ্যাস' 'পাইলট প্লান্ট' নামক ৬৮.৯৮ মিলিয়ন টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করে। আশা করা যায়, এ প্রকল্প দেশে জ্বালানির বিকল্প একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে। যদিও বিকল্প শক্তি প্রযুক্তিকে টেকসই করতে কিছু সমস্যা রয়েছে যেমন, প্রারম্ভিক খরচ বেশি, আবহাওয়া নির্ভরতা, সচেতনতার অভাব, যন্ত্রপাতির উচ্চ দাম ও আর্থিক সংকট।

স্বাস্থ্য সেবিকাদের কাজ ছেড়ে দেয়ার কারণসমূহ*

সোহেলা হক খান, আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী, ফজলুল করিম ও মিলন কান্তি বড়ুয়া

ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৭২ সালে। স্বাস্থ্য কর্মসূচির কিছু উপাদান পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরডিপি) অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৯১ সালে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে আরডিপিভুক্ত স্বাস্থ্য কর্মসূচির নামকরন করা হয় এসেনশিয়ার হেলথ কেয়ার (ইএইচসি) বা অত্যাবশ্যকীর স্বাস্থ্য পরিচর্যা। স্বাস্থ্য সেবিকারা এই ইএইচসি'র একটি প্রধান চালিকা শক্তি। তারা প্রকৃতপক্ষে গ্রামে অবৈতনিক সমাজসেবা কর্মী।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে উপযোগী করে তোলার জন্য প্রতিটি স্বাস্থ্য সেবিকাকে ব্র্যাকের খরচে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরবর্তীতে এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকাদের অনেকেই কাজ ছেড়ে দেয়। ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়াতে এ পর্যন্ত মোট ৫০ জন স্বাস্থ্য সেবিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ২২ জনই সেবিকার কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এদের হার ফুলবাড়িয়াতে ছিল ৪৪% এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৩১%। সামগ্রিকভাবে, সারা দেশব্যাপী ইএইচসি'র বাদ পড়া সেবিকার হার ৩২%। তবে ফুলবাড়িয়ার এই হার ময়মনসিংহ আঞ্চলিক এবং জাতীয় হারের প্রায় দেড়গুন। ইএইচসি কর্মসূচি এসব স্বাস্থ্য সেবিকাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যায় করে। কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া এসব স্বাস্থ্য সেবিকা ব্র্যাকের জন্য হারানো সম্পদের প্রতীক।

যাহোক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকাদের কাজ ছেড়ে দেয়ার কারণ উদ্‌ঘাটন এবং কর্মসূচিতে এর প্রভাব যাচাই করার জন্য ১৯৯৭ সালে এ গবেষণাটি করা হয়। সমীক্ষায় ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া থানার ১০ জন স্বস্থ্য সেবিকাকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। স্বাস্থ্য সেবিকার বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, জীবিত সন্তানের সংখ্যা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, শিক্ষা, পেশা, ব্র্যাক সদস্যপদ, কর্মসূচি ত্যাগ করার কারণ, কর্মসূচির উপর প্রভাব, ইত্যাদি বিষয়গুলো এ সমীক্ষায় বিবেচনা করা হয়েছে।

---

*'Reasons behind shasthya shebika dropout' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন নূরজাহান আকতার সেতু।

স্বাস্থ্য সেবিকাদের কাজ ছেড়ে দেয়ার যে সকল কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে তা হলো সময়ের স্বল্পতা, ঔষধ বিক্রি করে পর্যাপ্ত আয় না হওয়া (অর্থাৎ স্বাস্থ্য সেবিকারা মাসে মাত্র ১০০-৩০০ টাকা আয় করে যা মোটেই পর্যাপ্ত নয়), এবং এ কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজে লাভ বেশি (অর্থাৎ পশুপালন, সরকারি সেচ্ছা সেবিকা হওয়া) তাদের বক্তব্য হলো, "অল্প লাভের জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়"। তারপরেও ঔষধ বিক্রির জন্য পর্যাপ্ত ক্রেতা না পাওয়া কেনার প্রতি ক্রেতার অনীহা এবং এ কাজে পরিবারের পক্ষ থেকে অনীহা ইত্যাদি বিষয়কেও তারা বিশেষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

স্বাস্থ্য সেবিকাদের কাজ ছেড়ে দেয়ার ফলে কর্মসূচির উপর যে প্রভাব পড়ে তা হল অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয় না । যেমন, ঔষধ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং নলকূপ বিক্রি কমে যায়। এ ছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীদের সংখ্যা কমে যায়। সরকারি সেবা গ্রহণে সামজকে উদ্বুদ্ধ করার গতি হ্রাস পায় এবং কর্মসূচি ত্যাগের আরেকটি প্রভাব হচ্ছে এই কর্মসূচির ব্যায় বৃদ্ধি পায়। একটি কর্ম এলাকায় ইএইচসি'র চারজন কর্মী থাকে (১ জন ম্যানেজার, ১জন পিও এবং ২জন পিএ) স্বাস্থ্য সেবিকাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং তত্বাবধান তাদেরই দায়িত্বে থাকে। একজন স্বাস্থ্য সেবিকার পেছনে ন্যূনতম ১,০৪৯ টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের মধ্যে আছে ব্র্যাক কর্মীর বেতন,স্বাস্থ্য সেবিকার খাদ্য এবং প্রশিক্ষণ উপকরণ বাবদ ব্যয়। দেখা গেছে, ফুলবাড়িয়া থেকে ২২ জন চলে যাওয়ার কারণে সেখানে ন্যূনতমপক্ষে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাড়িয়েছে ২৩,০৭৮ টাকা।

যেসব স্বাস্থ্য সেবিকা কর্মসূচি ত্যাগ করে চলে গেছে তাদের বর্ণনা থেকে কিছু বিষয় জানা গেছে। যেমন, এ কাজটি স্বেচ্ছাসেবামূলক কিনা তা নিয়ে তারা দ্বিধান্বিত, ব্র্যাকের সেবার দাম বেশি, স্বাস্থ্য সেবিকাদের নিজ বাড়িতে কাজের চাপ, স্বাস্থ্য সেবিকাদের জনপ্রিয়তার বিষয়, স্বাস্থ্য সেবিকা বাছাইয়ের মানদন্ড নিয়ে সংশয়, কর্মসূচির সঠিক নির্দেশনার অভাব, স্বাস্থ্য সেবিকারা ডাক্তার নয় এই ধারণা এবং অন্যান্য কিছু বিষয়। সেবিকা চলে যাবার পেছনে যে সব কারণ শনাক্ত করা হয়েছে তা ইএইচসি'র অন্যান্য এলাকার জন্য প্রযোজ্য না হলেও এগুলোই কর্মসূচি ত্যাগের সম্ভাব্য কারণ বলে ধরে নেয়া যায়। তবে, আরডিপি'র ইএইচসি কর্মসূচি তার সেবা প্রদানের জন্য একটি সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং একটি বড় নমুনায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন ইএইচসি এলাকাতে সমীক্ষা চালানো হলে প্রাপ্ত তথ্য আরো সর্বজনীন হতে পারে।

এই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসূচির জন্য কতিপয় সুপারিশ করা হল। যেমন, প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করার সময় ইএইচসি যেন বিদ্যমান নির্দেশমালায় দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে যেমন, যারা গ্রুপ সদস্য নয় তাদের ইএইচসিভুক্ত না করা এবং বাজারের আশপাশের এলাকার স্বাস্থ্য সেবিকা বাছাই না করা; যাদের বয়স ৩০-৪০ বছর এমন স্বাস্থ্য সেবিকা বাছাই করা; যেসব মহিলা বিভিন্ন ধরনের কাজে সম্পৃক্ত তাদের বাছাই না করা; কর্ম এলাকার আয়তন যেখানে চার কিলোমিটার সেখানে শুধু একজন স্বাস্থ্য সেবিকা করা; ব্র্যাক কর্মীদের আরো সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা; এবং স্বাস্থ্য সেবিকা প্রশিক্ষণের সময় বিশেষভাবে উল্লেখ করা যে, স্বাস্থ্য সেবিকাদের প্রাথমিক কাজ হবে সেবাদান ও ঔষধ বিক্রি করা হবে তার দ্বিতীয় কাজ।

জাতীয় টিকা দিবস: জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ছে কি?*

আবদুলাহেল হাদী ও এফ এম কামাল

যে সকল মায়েদের ১-৫ বছরের শিশু রয়েছে তাদের মধ্যে টিকাদান সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং টিকাগ্রহণের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশে জাতীয় টিকাদান দিবস বা NID পালিত হয়। টিকাদান কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রায় এক যুগ ধরে বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীরা উৎসাহ দিয়ে আসছে। বাংলাদেশে ১৯৯৬ এর ৮ই ডিসেম্ভর এবং ১৯৯৭ এর ৮ই জানুয়ারী জাতীয় টিকাদান দিবস পালন করা হয়। ১৯৯৬ এর ডিসেম্ভরে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের পোলিও টিকা প্রদান এবং এক থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ভিটামিন "এ" খাওয়ানো হয়। ১৯৯৭ এর জানুয়ারীতে পুনরায় পোলিও টিকা দেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল রাতকানা এবং পোলিও রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, টিকা দেয়া এবং টিকাদান সংক্রান্ত সমস্যাগুলো দুরীকরণের চেষ্টা করা।

'ওয়াচ' (Watch) নামক ব্র্যাকের একটি নিরীক্ষণ পদ্ধতি বাংলাদেশের ১০টি জেলার ৭০টি গ্রামে কাজ করছে। দরিদ্র মানুষের সামাজিক জীবনে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে কী কী পরিবর্তন এসেছে তা দেখার জন্য এই প্রকল্পের সূচনা হয়। টিকা গ্রহণের হার নির্ধারণে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি কারণ এই শিশুদের ভিটামিন "এ" দেয়া হয়নি তবে তাদেরকে দুই ডোজ পোলিও টিকা দেয়া হয়। দেখা গেছে, ৭২% শিশু তিন ধরনের টিকার ডোজ পেয়েছে।

ডিসেম্বরে প্রায় ৮৯% এবং জানুয়ারিতে ৮৩% শুধু পোলিও টিকা পেয়েছে। পোলিও টিকা প্রদানের তুলনায় ভিটামিন "এ" নেয়ার হার কম। টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য তেমন কোন প্রভাব ফেলেনা অর্থ্যৎ বিষয়টা এমন নয় যে ছেলেদের মধ্যে টিকা গ্রহণের হার বেশি আর মেয়েদের মধ্যে কম। শিক্ষিত মায়েদের টিকা সম্পর্কে ধারণা বেশি স্পষ্ট এবং তাদের শিশুদের মধ্যেই টিকা গ্রহণের হার বেশি ছিল। জমির মালিকানা টিকাগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ভুমিকা রাখেনা। তবে ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী খানার

---

*'National immunization day (NID) campaign in Bangladesh: are the participation and coverage increasing' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (ডিসেম্বর ১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন জাবীন মোহসীন সংগীতা।

শিশুদের মধ্যে টিকাগ্রহণের হার বেশি। এটা স্পষ্ট ছিল যে, NID সম্পর্কে প্রচারণা ও এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতার কারণে গ্রামের দরিদ্র পরিবারেও NID সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে গেছে।

মোট অংশগ্রহণকারী শিশুদের প্রায় ৭২% টিকার দু'টো দিবসেই অংশ নেয়। অন্যদিকে প্রায় ৭% কখনই অংশ নেয়নি। এদের মধ্যে প্রায় ১০% ডিসেম্বরে থাকলেও জানুয়ারীতে ঝরে পড়ে। শিশুদের প্রায় ১১% ডিসেম্বরে টিকা না নিলেও জানুয়ারীতে আবার টিকা নেয়।

জাতীয় টিকা দিবসে টিকা গ্রহণ আবার এক এক এলাকায় এক এক রকম। দেখা গেছে, মৌলভীবাজারে টিকা গ্রহণের হার ৯০% এর ও বেশি অথচ কিশোরগঞ্জে এ হার মাত্র ২৩%। এ থেকে বোঝা যায় যে, টিকা বিষয়ে প্রচারণা সর্বত্র এক রকম ছিলনা।

এনজিও সদস্যদের শিশুরা অন্যান্য শিশু অপেক্ষা দু'টোতেই বেশি অংশগ্রহণ করে। এলাকা ভিত্তিক অংশগ্রহণ কুষ্টিয়া ও মৌলভী বাজারে সবচেয়ে বেশি। এবং কিশোরগঞ্জে সবচেয়ে কম। ঝরে পড়ার হার লালমনিরহাট এবং ঝালকাঠিতে সবচেয়ে বেশি। দেখা গেছে, এপ্রিল-মে মাসে NID'র প্রচারণা বৃদ্ধি পায় এবং ফলাফল আশাব্যঞ্জক অবস্থায় পৌঁছে।

সবশেষে বলা যায় যে, জাতীয় টিকা দিবসের কর্মসূচির সময় সীমা আরো সম্প্রসারিত করলে গ্রামীণ শিশুদের পোলিও রাত কানা রোগ থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

মুক্তাগাছায় ব্র্যাকের পুষ্টি প্রকল্প*

আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী, জেবা মাহমুদ,সাদিয় এ চৌধুরী, কে নাসের এবং এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার

অপুষ্টি বাংলাদেশের একটি বড় ধরনের জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ব্র্যাক ১৯৯৩ সাল থেকে থানা পর্যায়ে একটি পুষ্টি প্রকল্প চালিয়ে আসছে। দুঃস্থ মহিলাদের সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ে এই প্রকল্পে জোর দেয়া হয়। বিশেষ করে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশু, গর্ভবতী এবং যে মায়েরা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান তাদের মধ্যে অপুষ্টি ভীষণভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরী গ্রহণ এখনো আমাদের সংগতির বাহিরে রয়ে গেছে। অত্যধিক পরিমাণে সিরিয়াল জাতীয় খাদ্য গ্রহণ, ফলমূল ও শাক-সব্জির অপর্যাপ্ততার কারণে পরিমিত মাত্রায় ক্যালরী গ্রহণ সম্ভব হয় না। এ কারণেই বাংলাদেশের মহিলাদের গড় ওজন ৫০ কেজিরও কম।

গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের কঠোর শ্রম অপুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা গর্ভের শিশুর উপরও প্রভাব ফেলে এবং তাদের অধিকাংশই কম জন্মওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তার পুষ্টিমান খুবই কম। ফলে বছরে প্রায় ৩০,০০০ শিশু ভিটামিন 'এ'র অভাবে ভোগে, শতকারা ৪৭ ভাগ ভোগে আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড রোগে এবং ৭০ ভাগ গর্ববতী মা ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুরা রক্তস্বল্পতায় ভোগে।

বাংলাদেশে অপুষ্টির মূল কারণ দারিদ্র্য। জনগণের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতির জন্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয়ের সুযোগ রয়েছে নিতান্ত কম। শিশুদের অপুষ্টি হ্রাসে তাদের মধ্যে সরাসরি খাদ্য বন্টন ও পুষ্টি শিক্ষা কোন ভূমিকা রাখছে কিনা তা দেখার জন্য ব্র্যাক একটি পাইলট প্রকল্প শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল শিশু ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি সাধন ও জনগণের ক্ষমতায়ন। এই লক্ষ্যে ১৯৯১ এর জুলাই মাসে ১০টি থানার ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি কিছু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান শুরু করে। যেমনঃ

---

* `Muktagacha: a targeted nutrition project in Bangladesh' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (ডিসেম্বর ১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন জাবীন মোহসীন সংগীতা।

- মাতৃত্ব, প্রসব পূর্ববতী ও পরবর্তী সেবা;
- জন্ম নিরোধক ও এ বিষয়ে শিক্ষা;
- টিকা প্রদান;
- ভিটামিন 'এ' ক্যাপস্যুল বিতরণ;
- জন্মওজন ও দুই বছর পর্যন্ত ওজন পর্যবেক্ষণ (Growth Monitoring);
- যক্ষ্মা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- তীব্র শাসতন্ত্র প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ; এবং
- পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

১৯৯১ সালে জন্ম নিবন্ধকরণ প্রক্রিয়ায় দেখা যায়, শতকরা ৪৭ ভাগ শিশু কম জন্মওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ এলাকায় মোট জনসংখ্যা ১,৫৬,৫৪২ তন্মধ্যে দুই বৎসরের কম বয়সী ৫,০০০ শিশু এবং বাচ্চা ধারণক্ষম ২০,০০০ মহিলা ছিল। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল:

১. শিশু, কিশোরী ও গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টির অবস্থা নির্ধারণ ও নিয়মিত মনিটরিং করা;
২. অপুষ্টও পুষ্টিগত দিক দিয়ে হুমকির সম্মুখীন এমন শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের নির্ধারিত স্বল্প মেয়াদী পরিপূরক খাদ্য বিতরণ করা;
৩. পরিবারে মাতৃত্বকালীন খাদ্য বন্টনের গুরুত্ব এবং শিশুর খাদ্যভ্যাসে পরিবর্তন ঘটানোর জন্য শিক্ষা কার্যক্রমে পুষ্টি বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা; এবং
৪. প্রকল্পের কার্যক্রম সুস্পভাবে পরিচালনার জন্য একটি পরিকল্পিত পর্যবেক্ষণ ব্যবহার গড়ে তোলা।

দেখা গেছে ১৯৯১ সালে ময়মনসিংহ জেলার কম ওজনের শিশু জন্ম নেয় সবচেয়ে বেশি এবং মুক্তাগাছা থানায় এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। এখানে দুই বছরের বাচ্চাদের সার্বিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়েছে। অপুষ্টি মহিলাদেরকে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় পরিপূরক খাদ্য ছাড়াও শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি চাহিদা, দুগ্ধদান ও জন্ম ব্যবধান বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়।

যারা সবচেয়ে বেশি অপুষ্টিতে ভুগছে তাদের চিহ্নিত করতে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য মানের সাহায্য নেয়া হয়। এখানে নারী-পুরুষ ভেদান্তর করা হয়েছে কারণ মহিলারাই অপুষ্টির শিকার হন সবচেয়ে বেশি। প্রত্যেক মহিলাকে গর্ভকালীন সেবা কেন্দ্রে নিয়মিত আসার জন্য বলা হত। এই সেবা কেন্দ্রে মাসে একবার ওজন নেয়া ও গর্ভ-কালীন সেবা প্রদান করা হত। বাচ্চা প্রসবের পরে আরো ছয় মাস তাকে বাড়তি খাবারের পাশাপাশি পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়া হয়। যদি গর্ভকালীন তিন মাসের পর BMI ১৮.৫ এর কম হয় তবে তাদেরকে পরিপূরক খাবার সরবরাহ করা হয়।

যে কোন শিশু রেজিস্ট্রেশনের সাথে সাথে পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় চলে আসে। কম জন্মওজনের বাচ্চা এবং যে সকল শিশুর স্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি না ঘটে তাদেরকে খাবার সরবরাহ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

কিশোরী এবং ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রাতঃকালীন খাবার দেয়া হয়। এই সাথে ক্যালরী সম্পর্কিত জ্ঞানসহ প্রতিমাসে নিজেদের ওজন ও উচ্চতা নিজেরাই নিয়ে শিক্ষিকাদের সাথে আলোচনা করে। এছাড়াও এসকল লক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে যদি পুষ্টিহীনতা হ্রাস না পায় তবে এদেরকে নিকটস্থ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ব্র্যাকের সুস্বাস্থ্যে সেবা নেবার পরামর্শ দেয়া হয়।

সম্প্রসারিত টিকাদান ও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ কর্মসূচির পাশাপাশি আয়োজিত গ্রাম মনিটরিং পর্বে শিশুদের ওজন নেয়া হয়। শিশুর বৃদ্ধি পরিস্থিতি লিপিবদ্ধসহ মা শিশুর জন্য একটি শারীরিক কার্ড (Growth Card) পেয়ে থাকেন। ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষিকারাও মায়েদের পুষ্টি শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং শিশুর গ্রোথ কার্ডের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। মাসিক গ্রোথ মনিটরিং সেশন অনুষ্ঠানের সময় শিক্ষিকাদের সাথে কিশোরীরাও সাহায্য করে থাকে।

গ্রাম কমিটির সদস্যগণ স্বাস্থ্য কর্মীদের তত্ত্বাবধানে মোয়া তৈরী করে।এই কর্মসূচির আওতায় গর্ভবতী ও স্তনদান কারী মায়েদের প্রত্যেককে চারটি করে মোয়া দেয়া হয়। চিড়া, গুড় ও চিনাবাদাম দিয়ে এই

মোয়া বানানো হয় যার প্রত্যেকটিতে রয়েছে ৮৩৬ কিলোক্যালরি। স্বাস্থ্য কর্মীদের উপস্থিতিতে মায়েদের নিদেনপক্ষে দু'টি মোয়া খেতে হয়।

বাচ্চাদের খাদ্যের প্রতিটি প্যাকেটে রয়েছে ভাজা চালের গুড়া, ভাজা ডাল, গুড় এবং উদ্ভিজ্জ তেল। প্যাকেটগুলো ফিডিং সেন্টারে মায়েদের সরবরাহ করা হয়। সেখানে মা নিজ হাতে সব উপকরণ তেল ও পানির সাথে মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়ান। এতে একটি প্যাকেট থেকে একজন শিশু ১৬০ কিলোক্যালরী শক্তি অর্জন করে। যে বাচ্চারা অতিরিক্ত অপুষ্টিতে ভোগে তারা দু'টি প্যাকেট পেয়ে থাকে।

কিশোরীদের মুড়ি, গুড় ও চিনাবাদাম দেয়া হয়, যা তাদের ৬৪০ কিলোক্যালরী শক্তি প্রদান করে। স্কুলের শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্ত্বাবধানে তারা এ খাবার খেয়ে থাকে। কর্মসূচি ভালভাবে সম্পন্ন হলেও কিছু মায়েদের ক্ষেত্রে তা নিয়মিত করা সম্ভব হয়নি, কারণ ঐ সময় তারা গ্রামের বাইরে ছিল বা বাচ্চাসহ কেন্দ্রে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত কারণে দু'বছরের কম বয়সের ১০% বাচ্চা এবং ২৫% গর্ভবতী মহিলা কর্মসূচিভুক্ত ছিল না। এ ছাড়া সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার কারণেও মায়েরা বাচ্চা নিয়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারেনি।

যে সব বাচ্চা এই কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল না, তারা মাঝে মাঝেই তাদের মায়েদেরকে কেন্দ্রের খাবারের মত খাবার তৈরীর অনুরোধ করতো এবং তৈরী সহজ বলে মায়েরাও তা তৈরী করে খাওয়াতো। এই কর্মসূচির মাধ্যমে একটি পর্যায়ের মানুষ অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং কম ওজনের শিশুরা নির্দিষ্ট ওজন না পেলেও বাড়তি ওজন লাভ করেছে।

এই কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৬ সালে ২,৩৫৪ জন মহিলা খাদ্য সরবরাহ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং শতকরা ৮৩ জন সাধারণ জন্মওজনের বাচ্চা প্রসব করে। এবং দুই বছরে কম বয়সের ৫,৯৪৮ জন শিশুকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। পুষ্টিহীনতা বাংলাদেশে অনেকাংশে হ্রাস পেলেও এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। তাই বাংলাদেশ সরকার শিশু ও মায়েদের পুষ্টিহীনতা রোধে "বাংলাদেশ পুষ্টি প্রকল্প" নামে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ৪০টি থানায় পুষ্টি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এই পুষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাক এক বিশাল ভূমিকা পালন করছে।
নির্যাস ৪২

গ্রামাঞ্চলে শিশুদের অসুস্থতার ধরনঃ একটি সমীক্ষা*

রুখসানা গাজী, ফজলুল করিম ও আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিশু মৃত্যু এবং অসুস্থতার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে জন্মের সময় শিশুর ওজন কম থাকা (২,৫০০ গ্রামের নীচে)। তাছাড়াও জন্মের সময় কম ওজন হওয়া শিশুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এই সমস্ত দীর্ঘমেয়াদী ও ক্ষতিকর প্রভাবে শিশুদের কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। পরিণামে তাদের জীবনযাত্রার মান হয় নিম্নমূখী। অন্যদিকে, মায়ের পুষ্টিহীনতার কারণে জন্ম নেয় কম ওজনের শিশু। আর্থ-সামাজিক অনস্থা, পুষ্টি এবং পরিবশে শিশু স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত। আবার অভিভাবকদের শিক্ষার বিষয়টাও শিশু স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। অনেক সময় প্রসবকালীন জটিলতায় মা ও শিশু নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর যত শিশু জন্ম নেয় তার অর্ধেকই জন্ম গ্রহণ করে কম ওজন নিয়ে। কিন্তু জন্মের সময় কম ওজন শিশু স্বাস্থ্যের উপর কতটুকু প্রভাব ফেলে এ সম্পর্কে আমাদের খুব কমই জানা আছে। তাই শিশুদের অসুস্থতা ও তার চিকিৎসার উপর কম জন্মওজনের প্রভাবসমূহ জানার জন্য গ্রামীণ মা এবং শিশুদের উপর ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ একটি গবেষণা চালায়। মানিকগঞ্জ জেলার গ্রামীণ এলাকায় ব্র্যাক ১৯৮৬-৯০ পর্যন্ত কমিউনিটিবেজড প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। পরে এ কর্মসূচি ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে একীভুত হয়ে যায়। এই কর্মসূচিতে টিকাদান, ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল বিতরণ, পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, ধাত্রী ট্রেনিং, বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনা এবং রোগ নিরাময় সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেয়ার জন্য মায়েদের সংগঠন এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কমিটি গঠন করা হয়।

মানিকগঞ্জের ৩টি ইউনিয়নে ১৯৯৩-৯৪ সালে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। মোট ৬৪৪টি শিশুকে জন্ম থেকে শুরু করে এক বছর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভধারণের শেষ ৩

---

*‘Morbidity pattern of infants in rural Bangladesh’ শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (ডিসেম্বর ১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন জাবীন মোহসীন সংগীতা।

মাসের মধ্যে গর্ভবতীদের চিহ্নিত করা হয়। তাদের বয়স, প্রজনন ইতিহাস, পুষ্টি, শিক্ষা, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপরও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, জন্মের পর এক বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশু গড়ে প্রায় সাত বার অসুস্থ হয়েছে। এই শিশুরা শ্বাসনালীর সংক্রমণ, ডায়রিয়া, চর্মরোগ ও হামে সবচেয়ে বেশি ভুগেছে। জন্মের পর ১-১২ মাসের শিশুরা সবচেয়ে বেশি শ্বাসনালীর সংক্রমণে ভুগেছে এবং প্রথম ৪ মাসের তুলনায় ৫-১২ মাস বয়সে শিশুরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। এর সাথে চর্মরোগের প্রভাবও দেখা গেছে। ধনুষ্টংকার ও অন্যান্য অসুখ-বিসুখ খুব কম দেখা গেছে। এসব অসুখের সময় বাচ্চাদের জ্বরও হয়ে থাকে। ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে ১-১২ মাসের বাচ্চাদের সবচেয়ে বেশি হয় পানিযুক্ত পাতলা পায়খানা, তারপর আমাশয় এবং সবচেয়ে হয় রক্ত আমাশয়।

শিশুদের অসুস্থতার সাথে পরিবারের দারিদ্র্য, পিতা-মাতার নিরক্ষরতা, বসতবাড়ির মেঝের অবস্থা (অর্থাৎ পাকা না কাঁচা) ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার অভাব ইত্যাদি সম্পর্কযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। একটি মাত্র খানায় পাকা পায়খানা রয়েছে, এবং প্রায় সবাই (৯৭.৪০%) টিউবওয়েলের পানি পান করে। বসতবাড়ির ঘরের সংখ্যার সাথেও শিশুদের অসুস্থতার বিষয়টি সম্পর্কিত। দেখা গেছে, শতকরা ৩৬ ভাগ কোন চিকিৎসা পায়নি। এক মাস বয়সের শিশুদের শতকরা ৩.৫ ভাগ শিশুর রক্তশূন্যতা রয়েছে, ৩৮৮ জন শিশুর মধ্যে ৬০% কম জন্মওজন আর ৯% স্বাভাবিক ওজন নিয়ে জন্ম নেয়। প্রায় ৮৫% শিশু বিসিজি টিকা, ৮১% ডিপিটি, ৬২% হামের টিকা এবং ৮৬% ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল গ্রহণ করেছে। যে সকল শিশুরা অসুস্থতার সময়ে চিকিৎসা পেয়েছে তাদের ৭৪% এলোপ্যাথি চিকিৎসা ছাড়াও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা পেয়েছে। মোট ৩৬% শিশু কোন চিকিৎসা পায়নি। এই শিশুদের চিকিৎসা না নেওয়ার প্রধান কারণ হিসাবে মায়েরা উলেখ্ণ করেছেন যে, “অল্প অসুখের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না”।

শিশুকে যখন দুধের পাশাপাশি শক্ত খাবার দেয়া হয়, তখন ডায়রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আবার চর্মরোগের বড় কারণ হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন না থাকা। এই অসুখগুলোর জটিলতা সম্পর্কে সমাজের সকলকে অবহিত ও সচেতন করতে হবে যাতে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ডায়রিয়া প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং বসতবাড়ির ও

ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর সকলকে সচেতন করে তোলা জরুরী। শিশুদের খাবার তৈরী করার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ব্যাপারে মায়েদেরকে আরো সচেতন করে তুলতে হবে। যে সকল শিশু বার বার ডায়রিয়ায় ভুগছে ও হামে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের অসুখ সেরে যাওয়ার পরও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে যাতে শরীরে দ্রুত ক্ষয়পূরণ হয়।

মতলব থানার বয়স্ক জনগোষ্ঠির পুষ্টিজনিত সমস্যা*

সাবরিনা রশিদ, মাসুমা খাতুন ও এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার

বিশ্বব্যাপী বয়স্ক জনগোষ্ঠির হার বাড়লেও বাংলাদেশে এ চিত্র ভিন্নতর। পুষ্টিহীনতা বাংলাদেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠির উচ্চ মৃত্যু হার ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হয়। বয়স্ক জনগোষ্ঠি অর্থাৎ যাদের বয়স ৫৫ বছরের উর্ধ্বে তাদের পুষ্টির বর্তমান অবস্থা জানা ও এর কারণসমূহ উদ্ঘাটনের জন্য ব্র্যাক ১৯৯৭ এ মতলব থানার একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এতে দেখা গেছে যে, বয়স্ক জনগোষ্ঠির মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই বিভিন্ন মাত্রার পুষ্ঠিহীনতায় ভুগছে।

বয়স্ক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব আজ একটি সমাজ বিবর্তনমূলক সমস্যা। বর্তমানে প্রায় সকল দেশে এ সমস্যা বিদ্যমান। বয়স্ক জনগোষ্ঠি উন্নত বিশ্বে সমগ্র জনসংখ্যার একটি উলেøখযোগ্য অংশ এবং উন্নয়নশীল দেশে ইদানিং বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। তুলনামূলকভাবে অনেক কম হলেও সমাজ বিবর্তনের কারণে এই সংখ্যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (১৯৯৬) তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে ৫৬ বছরের বেশি বয়স্ক জনগোষ্ঠির সংখ্যা ৭৬ লাখেরও অধিক। যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্বেও মহিলাদের পারিবারিক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয়না। অসুস্থ ও অক্ষম বয়স্করা পরিবারের সম্পদের ঘাটতি ঘটায়। দীর্ঘস্থায়ী পুষ্ঠিহীনতা ব্যক্তির কর্মক্ষমতা হ্রাস করে এবং মনে করা হয়। এটি বয়স্ক জনগোষ্ঠির উচ্চ মৃত্যু হারের প্রধান কারণ। যদিও ৫৫ বছর বা তদুর্দ্ধ বয়সের জনগণ পরিবারের সুখ সমৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে, তবুও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনায় সাধারণত তাদের বিবেচনায় দেয়া হয় না। দেখা গেছে ৫৫ বছর বা তদুর্দ্ধ বয়স্কদের তুলনায় ৪৫-৫৪ বছর বয়স্ক জনগোষ্ঠির অপুষ্টিজনিত সমস্যা অনেক বেশি। পুষ্টিমান বিচারে মাত্র ২০% বয়স্ক জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক পুষ্টিমানে অবস্থান করছে।

ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় দেখা যায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি সমস্যায় বেশি ভোগে। মহিলাদের মাঝে (তলাকাপ্রাপ্ত বা নিঃসঙ্গ) অর্থনৈতিক কারণে এ সমস্যা আরও তীব্রভাবে বিদ্যমান। মহিলাদের শিক্ষার

---

* 'Prevalence of chronic energy dificiency in the elderly population of Matlab' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (অক্টোবর ১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন জাবীন মোহসীন সংগীতা।

বিষয়টি এই সমস্যা সাথে সম্পর্কযুক্ত। বয়স্ক বেকার পুরুষদের মধ্যেও এই সমস্যার প্রকোপ বেশি দেখা যায়। তবে পেশার প্রভাব মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যায় হেরফের হয়নি।

বার্ধক্য ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা হ্রাস করে। ফলে কিছু পরিবারিক দায়িত্ব বয়স্ক ব্যক্তির উপর হতে চলে গেলেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও দায়িত্ব তার উপর থেকেই যায়। আলোচ্য সমীক্ষাটিতে দেখা হয়েছে, কিভাবে বিভিন্ন পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও অথনৈতিক বিষয়সমূহ অপুষ্টির জন্য দায়। বয়স্ক পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অধিক হারে আক্রান্ত হচ্ছে। মহিলারা পুরুষদের থেকে অন্যরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বয়স্ক মহিলাদের অপুষ্টিজনিত সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। একজন অবিবাহিত নিঃসঙ্গ, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত মহিলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে তার পূর্বের আয় বা সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। সঙ্গী হারানো প্রয়োজনের সময় সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুর্বল করে দেয়। সমাজে বেশিরভাগ মহিলারা বৃদ্ধ বয়সে অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকে, মতলব থানায়ও একই অবস্থা বিদ্যমান। তাদের নিজস্ব কোন আয়-উৎপাদন না থাকায় ভরণ-পোষনের জন্য উপার্জনকারী ছেলে সন্তানদের উপর নির্ভর করতে হয়। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে বৈবাহিত অবস্থা অপুষ্টিজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রভাবিত করেনি অর্থাৎ লোকটি বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত এ বিষয়টি অপুষ্টির ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেনি।

বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ব্যবহারিক শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা পেশাগত জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়তা করে। তবে ব্যবহারিক শিক্ষার চাহিদা আমাদের দেশে অতটা না থাকার কারণে মহিলাদের কর্মসংস্থানে নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মহিলাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের সামাজিক মর্যাদা তুলনামূলকভাবে উচ্চ এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষা যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বয়স্ক জনগণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে খুব কমই অবদান রাখতে সক্ষম। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী এশিয়ার ৫৫ বছর উর্দ্ধের সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় ৬৩% পুরুষ ও ১৬% মহিলা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বয়স্ক জনগোষ্ঠী

গৃহস্থালীর কাজ ও যুবক শ্রেণী ঘরের বাইরে উপার্জনশীল কাজ করে। বয়স্কদের এই ধরনের পরোক্ষ অর্থনৈতিক কাজের কোন স্বীকৃতি নাই। আত্মসম্মান, সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সঞ্চয়ের সাথে উপার্জনের বিষয়টি অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফলে পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তি যত্ন, খাদ্য ও চিকিৎসা সুবিধা তুলনামূলক বেশি পায়।

পারিবারিক গৃহস্থালীর কাজ দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ তথাপিও এর অর্থনৈতিক স্বীকৃতি নেই। বয়স্ক বেকার পুরুষ জনগোষ্ঠির মধ্যে কর্মশক্তি ঘাটতিজনিত সমস্যার হার অনেক বেশি। মতলবের কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় তাদের কাজের ধরন ও ভুমি মালিকানার জন্য পুষ্টি বিবেচনায় বয়স্ক পুরুষরা অকৃষি কাজে নিযুক্তদের তুলনায় অনেক ভাল অবস্থানে আছে।

অর্থনৈতিক বঞ্চনা, স্বাস্থ্যগত অক্ষমতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি সীমাবদ্ধতার জন্য বয়স্ক জনগোষ্ঠী মর্যদাহীন অবস্থায় সন্তানদের সাথে জীবন যাপন করে। পরিবারের আয়-নির্ভর কাজসমূহের সমন্বয় করা গৃহকর্তার দায়িত্ব। আয়ভিত্তিক কর্মকান্ডে সাধারণত মহিলারা যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ নয়। ফলে মহিলাপ্রধান পরিবারের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ। পরিবারের কর্তা সকল ক্ষেত্রে প্রধান উপার্জনশীল ব্যক্তি নয় বরং বয়স ও সামাজিক অবস্থার কারণে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তা হিসেবে বিবেচিত হন। এই পর্যবেক্ষণে তীব্র পুষ্টি ঘাটতি সমস্যার লিঙ্গভেদে কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়না।

গবেষণার ফলাফল থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠি স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থানে রয়েছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে পেশা এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা, পরিবারের খাদ্য ব্যয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সাথে সম্পর্কিত। গ্রামাঞ্চলের বয়স্ক জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচির আওতায় উপযুক্ত প্রকল্প প্রণয়নের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

কম জন্মওজন ও শিশুমৃত্যুঃ গ্রাম বাংলার একটি চিত্র*

রুখসানা গাজী, ফজলুল করিম ও আহমেদ আলী

বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ হলো জন্মের সময় শিশুদের কম ওজন হওয়া (২,৫০০ গ্রামের নীচে)। বাংলাদেশে জনগণের গড় আয়ু মাত্র ৫৫ বছর, অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কায় একটি শিশু জন্ম নিলে সে ৭২ বছর পর্যন্ত বাঁচার আশা রাখে। একটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি চার জনে একজন শিশু তাদের পঞ্চম জন্মদিনের আগেই মারা যায়। আবার বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে জন্মের সময়েই শতকরা ৬০টি শিশু মারা যায়। মানিকগঞ্জের গ্রামীণ এলাকায় শিশু মৃত্যুর কারণ এবং এ সংক্রান্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রসূতি বিষয়ে জানার জন্য ব্র্যাক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে গর্ভবতী মহিলাদের চিহ্নিত করে তাদের তালিকাভুক্ত করা হয়। এ সময় তাদের বয়স, প্রজনন ইতিহাস, পুষ্টির পরিমাণ, শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি অবস্থাসহ বাসস্থানের পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার, পয়:নিস্কাশন সম্পর্কেও তথ্য নেয়া হয়। বাচ্চা জন্ম নেয়ার সংবাদ গবেষকদের নিকট পৌছানোর জন্য প্রত্যেক খানা থেকে একজনকে নির্বাচন করা হয়। বাচ্চা জন্ম নেয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ওজন নিয়ে তার রেজিষ্ট্রেশন করা হয়। মোট ৬৪৪টি বাচ্চাকে পরীক্ষার জন্য তালিকাভূক্ত করা হয় এবং এক বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে তার বড় হয়ে ওঠা, খাওয়ার অভ্যাস, অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়।

দেখা গেছে, ৬৪৪টি বাচ্চার মধ্যে ৩৪ জন শিশু ২ বছর বয়সেই মারা যায়, অর্থাৎ প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যু হার ৫৩ জন এবং ৭৩% শিশু জন্মকালে কম ওজনের কারণে মারা যায়। স্বাভাবিক বা কম জন্মওজন নিয়ে জন্মে যে শিশু তারা শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ ও ডায়রিয়ার কারণে সবচেয়ে বেশি মারা যায়। দেখা গেছে কম ওজন নিয়ে জন্ম নেয়া শিশুদের ২৫ জনের মধ্যে ২ জন অপুষ্টির কারণে মারা যায়।

---

* 'Low birth weight (LBW) was the major predicator of infant deaths: evidence from a prospective study in rural Bangladesh' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন জাবীন মোহসীন সংগীতা।

প্রায় ৬৭% শিশুর জন্মের সময় বুকের মাপ ৩০০ মিলিমিটারের কম ছিল। পর্যবেক্ষণকালে মৃত শিশুদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেশি (৫৮%)। প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩%) শিশু মারা যাবার আগে কোন চিকিৎসা পায়নি। অর্ধেক শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তাদের আত্মীয়রা চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়। তাছাড়া ৪১% এর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সহকারি, ১৮% এর ক্ষেত্রে গ্রাম্য চিকিৎসক এবং ১২% এর ক্ষেত্রে এমবিবিএস ডাক্তারের পরামর্শ নেয়। প্রায় ২৪% শিশুকে বৈদ্য বা ওঝা এবং ৯% কে মায়েরা নিজেরাই চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছে।

দেখা গেছে যে, বেশিরভাগ মা ২০ বছর বয়সের আগে প্রথম বাচ্চা নেয়। তারমধ্যে ৬৭% মা কোন লেখাপড়া জানে না। শতকরা ৭০ জন মায়ের একের অধিক বাচ্চা রয়েছে, এদের মধ্যে পাঁচ জনের পূর্বে মৃত শিশু জন্মসহ অন্যান্য অসুবিধা ছিল। গর্ভাবস্থায় অধিকাংশ (৫৫%) মায়ের ৪৫ কেজির কম এবং ৩২% মায়ের ৪৫-৫০ কেজি ওজন ছিল।

দেখা গেছে, যে সকল শিশু মারা গেছে জন্মের পরপরই তাদেরকে অবাঞ্চিত কিছু খাবার দেয়া হয়েছিল যেমন, বেশিরভাগ শিশুকে মধু খেতে দেয়া হয়েছে। খুব কম সংখ্যক শিশুকে শালদূধ দেয়া হয়েছিল। জন্মের প্রথম সপ্তাহে বেশিরভাগ শিশুকে অন্যান্য খাবার যেমন, গরু কিংবা ছাগলের দুধ এবং চিনির পানি খাওয়ানো হয়। যদিও শিশুদের পাঁচ মাস বয়সের আগে এসব খাবার শিশুর জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। যেসব শিশু কমওজন নিয়ে জন্ম নেয় তাদের জন্মের পরই মৃত্যু কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। প্রায় ৬০% মায়ের তাদের গর্ভের ৭ম মাসে ৪৫ কেজির কম ওজন পাওয়া গেছে। আর গর্ভাবস্থায় মায়ের ওজন কম হওয়ার ফলে শিশুও কম জন্মওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে ।

যে সকল শিশু কম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে দেখা গেছে তাদের খানা প্রধানদের পেশা হল দিন মজুরী কিংবা কৃষিকাজ ইত্যাদি। দেখা গেছে, ৭৯% খানার গরীব জনগোষ্ঠির ৫৮% শিশুর পিতার কোন শিক্ষা নেই। এ সব কারণ ছাড়াও পরিবারের আকার, ঘরের মেঝের অবস্থা (কাঁচা বা পাকা) খাবার পানি, এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইত্যাদি বিষয়গুলো শিশু মৃত্যুর সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত । দরিদ্র আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পিতা-মাতার নিরক্ষরতা, মায়ের বয়স (২০ বছরের কম), এবং প্রথম বাচ্চা, একই

মায়ের অধিক সন্তান জন্মদান ইত্যদি শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে। বুকের দুধ কম খাওয়ানো কলোস্ট্রাম না দেয়া এসব খাদ্যাভ্যাসও শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

গবেষণার ভিত্তিতে কর্মসূচির জন্য কতিপয় পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যেমন,

- শিশুর অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রধান কারণ যেমন, শ্বাসনালীর সংক্রমণ ও ডায়রিয়া সংক্রান্ত জটিলতা সম্পর্কিত লক্ষণগুলো পরিবারের সকল সদস্যকে জানাতে হবে। যাতে অসুস্থতা তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করা যায় এবং জটিল আকার ধারণ করার আগেই চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্ভব হয়;
- গ্রামাঞ্চলে সুলভ ও সহজলভ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- শিশুদের কম ওজন নিয়ে জন্ম নেয়া রোধ কল্পে গর্ভবতী মায়েদেরকে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে এবং সমাজের সকলকে এ ব্যপারে সচেতন করে তুলতে হবে; এবং
- শিশুর বয়স পাঁচ মাস পর্যপ্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়েদেরকে উৎসাহিত করতে হবে এবং শিশুদেরকে জন্মের পরপরই শালদুধ খওয়ানোর উপর জোর দিতে হবে।

ব্র্যাক সদস্য ও সদস্য নয় এমন পরিবারে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ধরনঃ মতলব এলাকা একটি সমীক্ষা*

সৈয়দ মাসুদ আহমদ, আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী ও আব্বাস ভুইয়া

গ্রামীণ দরিদ্রদের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুবিধা পৌছে দেয়া এবং এ বিষয়ে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের জনগণের অসুস্থতা ও চিকিৎসা গ্রহণের ধরন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যক। ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্র্যাক সদস্যদের জীবনে ও তাদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের উপর কী প্রভাব ফেলেছে তা দেখার জন্য ১৯৯৭ এ একটি গবেষণা করা হয়। ধারণা করা হয় যে, ব্র্যাকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি ব্র্যাক সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষত: বর্তমানে যারা বিনা চিকিৎসায় দিন কাটায় কিংবা অকার্যকর দেশীয় বা আধ্যাত্মিক চিকিৎসা নিয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে রোগ নিরাময়ের জন্য পাশ করা ডাক্তারগণ কিংবা অন্যান্যরা (পল্লী চিকিৎসার, ঔষুধের দোকানদার) রোগীদের এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে এই চিকিৎসা বেশ জনপ্রিয়। এর পরেই রয়েছে আয়ুর্বেদিক, ইউনানী ও হারবাল চিকিৎসার স্থান। তবে বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায়ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ভূমিকা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এমনও দেখা গেছে যে, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণ চিকিৎসার জন্য এলোপ্যাথিক ঔষধ গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছেন। অনেকেরই ধারণা হোমিওপ্যাথি কিংবা কবিরাজী ঔধধে রোগ নিরাময় হতে সময় বেশি লাগে। তাদের মতে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা স্থায়ীভাবে রোগ নিরাময় করতে পারে। এলাপ্যাথিক ঔষধে রোগ দ্রুত সরালেও স্থায়ীভাবে আরোগ্য লাভে সাহায্য করে না।

এই সমীক্ষায় মতলবে ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি যৌথ গবেষণা প্রকল্পের ১৯৯৫ সালে সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এ সময় ৩,৬৮৭টি খানার উপর জরিপ চালানো হয়। যার মধ্যে ৬০৪টি ছিল ব্র্যাক

* 'Health care-seeking behaviour of BRAC member and not-member households: evidence from Matlab, Bangladesh' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন নুরজাহান আকতার সেতু।

কর্মসূচিভুক্ত খানা এবং ১,৬৫৯টি সদস্য হবার যোগ্য কিন্তু সদস্য নয় এমন খানা। যারা ব্র্যাক সদস্য হবার যোগ্য নয় তাদেরকে এ বিশেষণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, সমীক্ষাধীন জনসংখ্যার ১৬% বিগত ১৫ দিনে কোন না কোন রোগে ভুগেছে। ব্র্যাক সদস্য হবার যোগ্য কিন্তু সদস্য নয় এমন খানার তুলনায় ব্র্যাকভুক্ত সসদ্য খানায় অসুস্থতার প্রকোপ কম। দেখা গেছে, অসুস্থদের এক পঞ্চমাংশ কোন চিকিৎসাই গ্রহণ করেনি এবং ৬-৮% রোগী ঘরে বসেই বিভিন্নভাবে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করেছে। যে রোগে তারা বেশি ভুগছে বলে জানিয়েছে তার মধ্যে জ্বর, ডায়রিয়া, আমাশয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংগে ব্যথা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ব্র্যাক সদস্য খানা ও অসদস্য খানার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি।

বয়স ও মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে, পাশ করা এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা গ্রহণ করেছে এমন খানার বড় অংশ হচ্ছে ব্র্যাক খানার সদস্যগণ। তবে সদস্য নয় কিন্তু সদস্য হবার যোগ্য এমন খানায় পাশ করা ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার ঘটনা অনেক কম। উল্লেখ্য, তুলনামূলকভাবে ব্র্যাক খানার সদস্যরা অধিক হারে হাতুড়ে ডাক্তারদের (পাশ করা নয়, কিন্তু এলোপ্যাথিক ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেয়) কাছেই চিকিৎসার জন্য গেছে। খানা প্রধানের সাক্ষরতার বিষয়টা স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে। যারা কায়িক শ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জন করে তাদের চেয়ে যারা জীবিকার জন্য কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল নয় তাদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের হার বেশি। পাশ করা ডাক্তারদের কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ সেটাও সাক্ষরতার সাথে জড়িত। অর্থাৎ নিরক্ষরদের মধ্যে পাশ করা ডাক্তারদের কাছ থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা কম। বাঁধের ভিতরে বসবাসকারী ব্র্যাক সদস্যরাই বেশি পাশ করা ডাক্তারদের চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বাঁধের ভিতরের তুলনায় বাইরের ব্র্যাক সদস্যারা বিনা চিকিৎসায় বেশি থাকে।

আইসিডিডিআর,বি-র প্রকল্প এলাকায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির কাজ শুরু করায় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। রোগীর বয়স, রোগের ধরন এবং রোগী ব্র্যাক সদস্য কিনা এই তিনটি বিষয়ই স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অনভিজ্ঞ ও অপেশাদার ডাক্তার ও ফকির-দরবেশদের কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এবং চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলাদের বৈষম্য হ্রাস করতে ব্র্যাকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে এ লক্ষ্যে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির

অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেরা (ইএইচসি) গ্রামীণ দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনলে ব্র্যাক আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

স্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্র্যাক কর্মসূচির প্রভাবঃ ব্র্যাক আইসিডিডিআর, বি যৌথ গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল*

সৈয়দ মাসুদ আহমদ

বাংলাদেশে নারী-পুরুষ কিংবা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজমান। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য আরো স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়। নারী ও পুরুষদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা এবং পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপক পার্থক্য থেকে তা বোঝা যায়। এর কারণ হিসাবে প্রভাবশালী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিগুলিকে দায়ী করা যায়। তবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিন্নতার কারণেও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির বৈষম্য লক্ষণীয়। বলা হয়ে থাকে উন্নয়ন কর্মসূচির ফলে গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। তবে এর স্বপক্ষে তেমন বাস্তব তথ্য পাওয়া যাবে না। এ সমীক্ষায় দেখা হয়েছে যে, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে প্রকৃতপক্ষে কোন ভূমিকা রাখে কিনা।

সমীক্ষার প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, যে সকল মায়েরা ব্র্যাক সদস্য তাদের সন্তানদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ব্র্যাকে যোগ দেননি এমন মায়েদের সন্তানদের চেয়ে বেশি। আরো দেখা গেছে যে, ব্র্যাকে অংশগ্রহণকারী মায়েদের সন্তানদের মৃত্যুহার অনেক কম (দেড়গুণ) যারা অংশগ্রহণ করেনি অন্তত তাদের সন্তানদের চেয়ে।

ব্র্যাক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মায়েদের সন্তানদের অপুষ্টিতে ভোগার সম্ভাবনাও অনেক কম। দেখা গেছে, ১৯৯২-১৯৯৫ সালের মধ্যে ব্র্যাকভুক্ত খানাগুলির শিশুদের চরম পুষ্টিহীনতার হার কমে এসেছে।

ব্র্যাকের অপর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা ব্র্যাকে যোগদান করেছেন অর্থাৎ যে মায়েরা ব্র্যাকের সদস্য তাদের মধ্যে লিংগ বৈষম্য অনেকটা কমে আসছে। যার প্রমাণ মিলেছে পরিবারে খাদ্য বন্টন সংক্রান্ত

* 'Health impact of BRAC interventions: evidence from BRAC-ICDDR,B joint research project' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উলাহ্‌।

ব্র্যাকের একটি সমীক্ষায়। দেখা গেছে, অংশগ্রহণ করেনি এমন পরিবারের তুলনায় অংশগ্রহণকারী পরিবারে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে খাদ্য বন্টনের ক্ষেত্রে বেশি সমতা বজায় থাকে। খানায় ক্যালরি গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্র্যাকের কর্মসূচি এভাবেই ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

ব্র্যাক সদস্য হওয়ার যোগ্য অথচ সদস্য নয় কিংবা সদস্য হওয়ার যোগ্য নয় এমন সব খানার তুলনায় ব্র্যাকের কর্মসূচিভুক্ত খানায় অসুস্থতার হার অনেক কম। নারী-পুরুষদের অসুস্থতার হার সমান হলেও চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়েরা অনেক পিছিয়ে আছে। এর একটা কারণ হতে পারে যে, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে মেয়েদের অসুস্থতাকে কমই গুরুত্ব দেয়া হয়। আশার কথা এই যে, এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহণের হার ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত খানার নারী সদস্যদের মধ্যে বেশি।

ব্র্যাক খানার মহিলা সদস্যদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পরিবারের আকার সীমিত রাখতে মহিলারা প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছেন। অর্থাৎ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার তাদের মধ্যে বেশি। পারিবারিক পরিচ্ছন্নতা ও খানার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষায়ও ব্র্যাক সদস্যদের ভূমিকা বেশি।

গবেষণায় এটা প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ব্র্যাক যে উন্নয়ন কর্মকান্ড চালু রেখেছে তা নিশ্চিতভাবেই দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কোন না কোন ভূমিকা রাখছে। তবে লিংগ বৈষম্য হ্রাস করতে হলে আরো কাজ করতে হবে।

গর্ভকালীন রক্তস্বল্পতাঃ একটি গ্রামীণ পটভুমি*

এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার

রক্তস্বল্পতা বহুল আলোচিত একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এ সমস্যা বিশ্বব্যাপী বিরাজমান। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলারা বেশি মাত্রার রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ২,১৫০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠি রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। রক্তস্বল্পতায় আক্রান্তদের বেশিরভাগই দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকায় বসবাস করে। গর্ভকালীন রক্তস্বল্পতা শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশেরই নয়, উন্নত বিশ্বেও একটি স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে বিবেচিত। উন্নয়নশীল দেশে গড়ে ৫৫-৬০ শতাংশ উন্নত দেশের ১৮ শতাংশ মানুষ রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। একই সূত্র মতে দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে প্রায় ৭৫ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা রক্তস্বল্পতার কারণে প্রসবকালীন মৃত্যু-ঝুঁকির সম্মুখীন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ১১০ গ্রাম/লিটার এর কম থাকলে তাকে রক্ত-স্বল্পতা বলে ধরা হয়। গর্ভবতী মায়ের রক্তস্বল্পতার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে খাদ্যে আয়রণ ও ফোলেটের অভাব, কৃমির সংক্রমণ, ম্যালেরিয়া, এইচআইভি সংক্রমণ এবং হিমোগ্লোবিনো-প্যাথিস অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন সংক্রান্ত জটিলতা অন্যতম। গর্ভকালীন রক্তস্বল্পতার নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে মাতৃত্বজনিত মৃত্যু, বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব এবং প্রসবের পর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে বিলম্ব ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়াও মায়েদের রক্তস্বল্পতার নেতিবাচক প্রভাব নবজাতকের উপর পড়ে। মায়েদের রক্তস্বল্পতার কারণে হয় কম ওজনের শিশু জন্মগ্রহণ করে নতুবা মৃত শিশু জন্ম নেয়।

রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশে কতিপয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি ব্র্যাকও গর্ভবতী মহিলাদের আয়রণ বড়ি সরবরাহ করে থাকে। স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে ব্র্যাকের এসেনসিয়াল হেলথ কোয়ার (EHC) কর্মসূচিও গর্ভবতী মহিলাদের আয়রণ বড়ি সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষাও

---

* 'Anaemia in pregnancy: evidence from a rural area' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এস এম জিয়াউদ্দীন হায়দার।

দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের গর্ভকালীন রক্তস্বল্পতা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য জানা নেই। তবে সর্বশেষে জাতীয় পুষ্টি সমীক্ষার (১৯৮১-৮২) মতে, প্রায় ৪৭ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা রক্তস্বল্পতার শিকার (হিমোগ্লোবিন ১১০ গ্রাম/লিটার এর কম)।

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য সাটুরিয়া ও ফুলবাড়ীয়া থানার মোট ১২টি গ্রাম থেকে মোট ১২২ জন গর্ভবতীকে প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা হয়েছিল। শনাক্তকৃত গর্ভবতীদের মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত ৯০ জনকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ পটভুমিতে গর্ভবতী মহিলাদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ণয় ও রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব দেখা এবং রক্তস্বল্পতার সাথে সম্পর্কযুক্ত আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রেক্ষাপটগুলোকে শনাক্ত করা।

সমীক্ষাভুক্ত ৯০ জন গর্ভবতীর বয়স ছিল ১৪-৪১ বৎসরের মধ্যে। প্রত্যেক গর্ভবতী গড়ে ৩ সন্তানের মা এবং তথ্য সংগ্রহের সময় গর্ভের গড় বয়স ছিল ৫ মাস। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত গর্ভবতীদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ছিল ৭৯-১৩৯ গ্রাম/লিটার এর মধ্যে। গড় পরিমাণ ছিল ১১২ গ্রাম/লিটার। রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব ছিল ৫৪ শতাংশ এবং মারাত্মক রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব ছিল মাত্র এক শতাংশ।

সাক্ষরতার সাথে রক্তস্বল্পতা প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল। সাক্ষর মহিলাদের এক চতুর্থাংশ রক্তস্বল্পতায় ভুগছিল অপর দিকে নিরক্ষরদের মধ্যে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ রক্তস্বল্পতার শিকার। সাটুরিয়ার তুলনায় ফুলবাড়ীয়া থানায় মহিলাদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব কিছুটা বেশি ছিল। যে সকল মহিলারা গর্ভবতী হওয়ার পরে আয়রণ বড়ি খাওয়া শুরু করেছিল তাদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব তুলনামূলকভাবে কম ছিল। আর যারা বড়ি খাওয়া শুরু করেনি তাদের রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব বেশি ছিল। ব্র্যাকের এক বছর বয়সের সদস্যদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব অন্যদের তুলনায় কম ছিল।

গত ১৫ বৎসরে বাংলাদেশে রক্তস্বল্পতার উপর তেমন কোন নিবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। সর্বশেষ জাতীয় পুষ্টি জরিপ (১৯৮১-৮২) অনুযায়ী বাংলাদেশের রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব ছিল ৪৭ শতাংশ যা বর্তমান পরিস্থিতির তুলনায় অনেক বেশি। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ যাবৎ রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ হয়নি এবং রক্তস্বল্পতা গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য এখনও একটি জটিল স্বাস্থ্য

সমস্যা হিসেবেই রয়ে গেছে। বর্তমান গবেষণাটি অপেক্ষাকৃত-ভাবে ছোট জনগোষ্ঠির উপর করা হয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্যের বিশদ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, সাক্ষরতার বিষয়টি রক্তস্বল্পতার সাথে সম্পর্কিত। সাটুরিয়াতে সাক্ষরতার হার ফুলবাড়ীয়ার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ছিল। তাই হয়ত সাটুরিয়ায় রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব কম। এ ক্ষেত্রে মায়েদের সাক্ষরতার গুরুত্ব আরো অনেক বেশি। শিক্ষিত মায়েরা হয়ত বিভিন্ন স্বাস্থ্য ফোরাম, প্রোগ্রাম, সংবাদ ও অন্যান্য মাধ্যমে থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে অধিক পরিমাণে বুঝতে ও গ্রহণ করতে সক্ষম। ফলে রক্তস্বল্পতা বিষয়ে জ্ঞান, সচেতনতা, এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, মায়ের শিক্ষা শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ সহায়ক ভুমিকা পালন করে। সুতরাং মায়েদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব কমানোর জন্য যত বেশি সম্ভব মহিলাদেরকে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক হোক কিংবা অনানুষ্ঠানিকই হোক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা জরুরী।

এ ছাড়াও আয়রণ বড়ি রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব কামাতে সাহায্য করে। চেষ্টা করতে হবে যাতে বর্তমান স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে আয়রণ বড়ির বিতরণ বাড়ানো যায়। একই সাথে মহিলাদেরকে নিয়মিত বড়ি সেবনের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। আরেকটি দিক হল মহিলাদের ব্র্যাকে সদস্য পদের সময় বাড়লে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব কমে যায়। বিভিন্ন কারণে হয়ত এরকম হতে পারে যেমন, উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ততা, নিয়মিত গ্রুপ মিটিং এ যোগদানের ফলে সাধারণ স্বাস্থ্য জ্ঞানের উন্নতি এবং স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্যাভিত্তিক আলোচনা ও আয়রণ বড়ি প্রদান।

রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের জন্য লোকালয় ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র উভয় জায়গাতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। লোকালয়ে রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থাও যেমন দারিদ্র্য দূরীকরণ ও পুষ্টির অবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মধ্যে যথাশীঘ্র সম্ভব রক্তস্বল্পতা শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও যথেষ্ট পরিমাণে আয়রণ বড়ি সরবরাহের নিশ্চয়তা অন্যতম। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্টির রক্তস্বল্পতা হ্রাস সম্ভব।

কক্সবাজার জেলায় রিকেট্‌স রোগের ব্যাপকতা*

ফজলুল করিম, আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী ও মো. সওকত গনি

কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া থানার ১-১৫ বৎসর বয়সের শিশু এবং যুবকদের মধ্যে রিকেট্‌স রোগের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা গেছে। রিকেট্‌স আক্রান্ত এলাকাসমুহ দ্রুত চিহ্নত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী একটি প্রাথমিক জরিপ পরিচালনা করা জন্য বাংলাদেশ রিকেট্‌স প্রিভেনশান কনসোর্টিয়াম ব্র্যাককে অনুরোধ করেছিল। দেশব্যাপী জরিপ চালানোর পূর্বে ব্র্যাক প্রথমে কক্সবাজারে রিকেট্‌স রোগের ব্যাপকতা জানার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সমীক্ষার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য ঢাকার আইসিএমএইচ, (শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান), যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিসেফ এবং বাংলাদেশের সার্পভ (সোশ্যাল এ্যাসিসট্যান্স এন্ড রিহেবিলিটেশন্স ফর ফিজিক্যালি ভালনেরাবল - SARPV) প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেয়।

এ সমীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কক্সবাজার জেলায় ১-২০ বৎসর বয়সের শিশুদের শরীরে রিকেট্‌স রোগের ব্যাপকতা জানা এবং দেশব্যাপী জরিপ করার জন্য ফলপ্রসু পদ্ধতি নির্ধারণ করা। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সালের মে-জুলাই মাসে একটি জরিপ চালানো হয় কক্সবাজার জেলার ৭টি থানার ২৮টি গ্রামে।

রিকেট্‌স রোগীর পোষ্টার দেখিয়ে এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও কিছু সংগঠনের সহযোগিতায় তথ্য সংগ্রহকারীগণ ৭টি থানায় উলেখ্থিত বয়সের ৪৯০ জন প্রতিবন্ধীকে শনাক্ত করেন। এদের মধ্যে ৩৪৯ জনকে তারা রিকেট্‌স আক্রান্ত মনে করেন। পরবর্তীতে চিকিৎসকগণ ৫টি থানার ২৭৮ জন প্রতিবন্ধীকে শারীরিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে ১১৬ জনকে রিকেট্‌স আক্রান্ত বলে শনাক্ত করেন। কিন্তু তথ্য সংগ্রহকারীগণ এই ২৭৮ জনের মধ্যে ১৯৯ জনকে রিকেট্‌স আক্রান্ত মনে করেছিলেন। অর্থাৎ চিকিৎসকগণ এদের মাঝে ৫৮% কে রিকেট্‌স আক্রান্ত বলে শনাক্ত করেছেন। বাকী যে ৭৯ জনকে (২৭৮-১৯৯) তথ্য সংগ্রহকারীগণ অন্যান্য প্রতিবন্ধী বলে ধারণা করেছিলেন তাদের ৬% কে চিকিৎসকগণ রিকেট্‌স আক্রান্ত বলে শনাক্ত করেছেন। এছাড়াও ডাক্তারগণ উক্ত এলাকা পরিদর্শনের

*'Prevalence of lower limb clinical rickets: a quick assessment' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০০)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. সওকত গনি।

সময় আরো ১৬ জন নতুন রিকেট্স রোগী শনাক্ত করেন যা তথ্য সংগ্রহকারীগণ প্রতিবন্ধী তালিকায় আনতে পারেননি। দু'টি থানায় ডাক্তারগণ আবহাওয়া ও সমস্যা সঙ্কুল যাতায়াত ব্যবস্থার করণে যেতে পারেননি। পাঁচটি থানায় প্রাপ্ত রিকেট্স রোগীর ব্যাপকতার উপর ভিত্তি করে কক্সবাজার জেলায় রিকেট্স সম্ভাব্য ব্যাপকতা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

কক্সবাজারে প্রতি এক লক্ষ শিশুর মধ্যে প্রায় ৯০৭টি শিশু শরীরের নিম্নাংগে রিকেট্স রোগে আক্রান্ত, কুতুবদিয়ায় সবচেয়ে বেশি (প্রতি লক্ষে প্রায় ১,৪৩৮টি) এবং মহেশখালীতে সবচেয়ে কম (প্রতি লক্ষে প্রায় ৬২৪টি)। দেখা গেছে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে রিকেট্স রোগের ব্যাপকতা কমাতে থাকে এবং ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে এই রোগের ব্যাপকতা খানিকটা কম।

রিকেট্স আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে লাগানো হাটু (Knock-knee) (৩৮%) এবং সবচেয়ে কম বাঁকানো হাটু (Wind-swept) (১৫%)। প্রায় ৮৬ শতাংশ রিকেট্স রোগীই কেবল মাত্র এক চিহ্নযুক্ত বৈশিষ্ট্যের। উলেখ্য, দেশের অন্যান্য জায়গায় রিকেট্স এর অস্তিত্ব দেখার জন্য নোয়াখালী, ভোলা, যশোর, সুনামগঞ্জ এবং গাইবন্ধা জেলায় প্রাথমিক পরিদর্শন করা হয়েছিল। ভোলা জেলা ব্যতিত অন্য চার জেলায় রিকেট্স রোগীর সন্ধান মিলেছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, সারা দেশেই রিকেট্স রোগী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

বাংলাদেশ যখন পোলিও দূর করার সংগ্রামে লিপ্ত ঠিক তখনই জীবন বিধ্বংসী রিকেট্স রোগের আগমন ধ্বনি গণস্বাস্থ্যের জন্য এক নতুন হুমকি। কক্সবাজার জেলার ১-২০ বৎসর বয়সের শিশু এবং যুবকদের মধ্যে শতকরা প্রায় একভাগ রিকেট্স আক্রান্ত। পরিশেষে, কক্সবাজারের জরিপ এবং দেশের অন্য পাঁচ জেলার দ্রুত পর্যবেক্ষণ থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, রিকেট্স রোগের ব্যাপকতা এবং এর কারণ খুঁজে বের করার জন্য সারা দেশে আরো বড় আকারে সমীক্ষা চালানো একান্ত জরুরী।

নির্যাসের পূর্ববর্তী খণ্ডসমূহে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ

খণ্ড ১ মার্চ ১৯৯৫

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

সাইক্লোনোত্তর পরিস্থিতি: একটি সমীক্ষা

বাংলাদেশে ভূমিহীন মানুষের দৈনন্দিন জীবন

দরিদ্রদের জন্য ব্র্যাকের গৃহায়ণ কর্মসূচি: একটি সমীক্ষা

গ্রাম সংগঠনগুলোকে নিয়ে ফেডারেশন গঠন: কিছু অভিমত

ব্র্যাকের প্যারালিগ্যাল কর্মসূচি: একটি সমীক্ষা

আরডিপিভুক্ত গ্রাম সংগঠনের বিষয়ভিত্তিক সভা

পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ: একটি কোর্সের মূল্যায়ন

মাসিক রক্তস্রাব: কিশোরী মেয়েদের বিশ্বাস ও আচরণ

ভূমিহীনদের মালিকানায় সেচ ব্যবস্থা ও সমাজে তার প্রভাব

পল্লী এলাকায় সাক্ষরতা: এনএফপিইভুক্ত কয়েকটি গ্রামের চিত্র

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি স্কুলে কেমন করছে

প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: গ্রামের একটি স্কুল সমীক্ষার ফলাফল

পল্লীর দরিদ্র মানুষের জীবনে মৎস্যচাষের প্রভাব

পল্লীর দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া

পূর্বেকার যৌথ ঋণ অনাদায়ী থাকার কারণ

বাংলাদেশে পল্লী রেশনিং ব্যবস্থা: একটি মূল্যায়ন

আইজিভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব: একটি উপজেলায় পোল্ট্রি কর্মীদের কার্যক্রমের সমীক্ষা

স্বাস্থ্য বিষয়ক

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা: শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি নিরীক্ষণ

স্বাস্থ্যসেবিকাদের কাজের একটি মূল্যায়ন

মহিলাদের গর্ভধারণ এবং গর্ভনিরোধক ব্যবহার

স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে মাদার্স ক্লাবের প্রভাব

বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে ডায়রিয়ার প্রচলিত নাম

পল্লী এলাকায় চাল-লবণের তৈরী খাবার স্যালাইনের ব্যবহার

খণ্ড ২ ডিসেম্বর ১৯৯৫

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

পল্লী এলাকার কয়েকটি অবহেলিত স্কুলের উপর একটি সমীক্ষা

বাংলাদেশে শিশুদের মৌলিক শিক্ষার মূল্যায়ন

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষার মূল্যায়ন

এনএফপিই শিক্ষকদের ইংরেজী ও অংক বিষয়ক পারদর্শিতা এবং অন্যান্য বিষয়

দারিদ্র্য দূরীকরণে গ্রামীণ নারী: ছয়টি সমীক্ষা

আইজিভিজিডি ও ভিজিডি কর্মসূচিভুক্ত শিশু-কিশোর ও মায়েদের উপর অপুষ্টির প্রভাব

বৈবাহিক সম্পর্ক ও নারী নির্যাতন: একটি সমীক্ষা

কিশোরী মেয়েদের দৃষ্টিতে বিবাহ

গ্রামীণ মহিলাদের আয়মূলক কাজের ব্যবস্থাপনা: মির্জাপুর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা

ব্র্যাক সমিতি: সমষ্টির অংশগ্রহণ না কতিপয়ের নিয়ন্ত্রণ

পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল্যায়ন

জেলে পরিবারে নারী: বাওর এলাকার চিত্র

স্বাস্থ্য বিষয়ক

স্যাটেলাইট ক্লিনিকের লক্ষ্য অর্জনে ব্র্যাকের ভূমিকা ইতিবাচক অবদান রাখবে: একটি প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য শিক্ষা কি গ্রামীণ জনসাধারণকে অধিক স্বাস্থ্য সচেতন করতে পেরেছে?

গ্রামীণ জনগোষ্ঠির মৃত্যুহার কমানোর উপর ব্র্যাকের কর্মসূচির প্রভাব

বাংলাদেশের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর উপর একটি সমীক্ষা

গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের উপর আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির প্রভাব

ব্র্যাকের দৈহিক বৃদ্ধি নিরীক্ষণ কর্মসূচি: একটি সমীক্ষা

খণ্ড ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

সুরুচি রেস্তোরার ব্যবস্থাপনা: মহিলাদের একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস

শিল্পউদ্যোগ সৃষ্টিতে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের ভূমিকা

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের উপর একটি জরিপ

দরিদ্রদের আইনি জ্ঞান: নির্বাচিত বেসলাইন তথ্য

ব্র্যাকের রেশম চাষ প্রকল্প: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশে জমির মালিকানা এবং ভোগ দখলের ধরন: একটি গ্রাম সমীক্ষা

মানিকগঞ্জের গিলন্ডা গ্রামে ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

মানিকগঞ্জের গুর্কি গ্রামে ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের জীবন দক্ষতার জ্ঞানের উপর

কয়েকটি বাছাইকৃত আর্থ-সামাজিক উপাদানের প্রভাব: একটি বহুমুখী বিশ্লেষণ

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে মাধ্যমিক স্কুল ছেড়ে দেয়?

স্বাস্থ্য বিষয়ক

গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট সেবনের উপর একটি মূল্যায়ন

গর্ভবতী মহিলাদের সেবা প্রদানে ব্র্যাকের ভূমিকা

সন্তান প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী অসুস্থতা সম্পর্কে গ্রাম বাংলায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা

গ্রামের পুরুষ এবং মহিলাদের দৃষ্টিতে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা

স্বাস্থ্য ও মহিলাদের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন নির্ণয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি:
একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি: প্রতিদ্বন্দ্বিতা না সহযোগিতা?

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের পুষ্টি ও দারিদ্র্য

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাব

দরিদ্রদের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে নিম্ন পর্যায়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগকে বেছে নেয়াই কি উত্তম?

ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত কল্পে গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি গঠন

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ কী এ কর্মসূচির কাজকে বোঝা মনে করে?

সরকারি কর্মী, জনসাধারণ ও ব্র্যাকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের উপর মহিলা স্বাস্থ্য ও
উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

খণ্ড ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

সম্পাদকীয়: রজত জয়ন্তী সংখ্যা

ব্র্যাক গবেষণার একুশ বছর: কিছু প্রাসংগিক কথা

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

ব্র্যাকের পাইলট সঞ্চয় প্রকল্পের উপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন

গ্রামীণ জনগণের সমস্যা মোকাবেলা ও বেঁচে থাকার কৌশল

মতলব থানায় ব্র্যাকের দু'টি স্কুলের উপর একটি সমীক্ষা

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষার উপর একটি সমীক্ষা

মোরগ-মুরগী পালনে ভূমিহীন দরিদ্র নারী সমাজ: পাঁচটি গ্রামের চিত্র

ব্র্যাকের মহিলা কর্মসূচি সংগঠকদের সমস্যা: একটি সমীক্ষা

ব্র্যাকের অর্থপুষ্ট প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি: মতলব এলাকার সাতটি ক্ষুদ্র ব্যবসার উপর একটি সমীক্ষা

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনভুক্ত পাঁচ জন মহিলা সদস্যার সাফল্যের খতিয়ান

সদস্যদের গ্রাম সংগঠন ছেড়ে যাওয়ার কারণ: একটি সমীক্ষা

গ্রাম সংগঠন গঠন প্রক্রিয়ার উপর একটি পর্যবেক্ষণ

গ্রামীণ বাংলাদেশে ঋণ ব্যবস্থাপনা: জামালপুর জেলার নারায়ণপুর গ্রামের একটি চিত্র

কাজের সময়, আয় ও ব্যয়ের ঋতু ভিত্তিক তারতম্য: একটি সমীক্ষা

ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের অপ্রচলিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

মহিলা প্রধান খানায় কী কী কারণে মহিলারা ঝুঁকির সম্মুখীন হন

স্বাস্থ্য বিষয়ক

মতলব এলাকার আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উপর ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি-র যৌথ গবেষণা প্রকল্পের বেজলাইন জরিপ

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে মায়েদের ধারণা

বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের পুষ্টিহীনতা: আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

ব্র্যাকের পুষ্টি বিষয়ক কয়েকটি গবেষণার উপর একটি প্রতিবেদন

ব্র্যাকের 'ওয়াচ' প্রকল্পের স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি গবেষণা

স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে গর্ভনিরোধক বিক্রয়: সমস্যা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

যৌনব্যাধি সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী সমীক্ষা: দু'টি এলাকার চিত্র

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক একটি মূল্যায়ন

খাবার স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি ও এর ব্যবহারবিধি গ্রামীণ মায়েরা কতদিন মনে রাখতে পারেন?

ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় প্রসূতি মৃত্যুর কারণ ও এতদসংশিষ্ট বিষয়সমূহের উপর সমীক্ষা

পল্লী এলাকায় ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু হারে পরিবর্তন

ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি: চিকিৎসা সমাপ্তকারী রোগীদের উপর একটি সমীক্ষা

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের জ্ঞান ও তার চর্চার উপর একটি সমীক্ষা

খণ্ড ৫ নভেম্বর ১৯৯৭

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব: একটি বিশেষ সমীক্ষা

ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা: একটি সমীক্ষা

কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব: ঝিকরগাছা এলাকার চিত্র

গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের ঋণদান কর্মসূচির প্রভাব:
জামালপুর জেলার পাঁচটি গ্রামের চিত্র

মহিলা প্রধান খানার সমস্যাসমূহ

গ্রাম সংগঠন সদস্যদের সঞ্চয়ী অর্থের ব্যবহার

নারী পুরুষ সম্পর্কের উপর মহিলাদের মজুরীভিত্তিক কাজ ও ঋণের প্রভাব

ঋতুভেদে গ্রামীণ দরিদ্রদের খাদ্য গ্রহণের তারতম্য: একটি সমীক্ষা

লক্ষীভূত জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণে আরআরএ পদ্ধতি প্রয়োগ: লালমনিরহাট সদর থানার একটি সমীক্ষা

গ্রামীণ বাংলাদেশে শিশু শ্রম

সাক্ষরতার প্রসার: মানিকগঞ্জে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব

উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের আদর্শায়িত কৃতি অভীক্ষা

ছেলে ও মেয়েদের স্কুলে ভর্তি অবস্থা: প্রেক্ষিত গ্রাম বাংলা

ভর্তির প্রথম ছয় মাসের মধ্যে স্কুল ছেড়ে দেয়ার কারণ: ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর একটি সমীক্ষা

স্বাস্থ্য বিষয়ক

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মী: ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা

স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ধরন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের সমাজ

পাঁচ বছরের কম বয়সী গ্রামীণ শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির উপর একটি সমীক্ষা

মায়েদের টিকাদান সম্পর্কিত জ্ঞান গ্রামীণ এলাকায় শিশুদের টিকাদানের ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখে?

পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইজিভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব

পরিবারের আকার নির্ধারণে মতলব এলাকায় দম্পতিদের পছন্দ

জন্মশীলতা পরিবর্তনে গ্রামীণ এলাকায় ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় গর্ভনিরোধক ব্যবহারে পরিবর্তন

খণ্ড ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

সম্পাদকীয়

নির্যাস পাঠক জরিপ: মাঠ পর্যায়ের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

ব্র্যাকের মানবাধিকার এবং আইন শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রভাব: একটি মূল্যায়ন

ব্র্যাকের কৃষি, মৎস্য, বন ও রেশম চাষ প্রকল্প: পরিবেশগত একটি সমীক্ষা

মতলব এলাকায় ১৯৯২-৯৫ এ আরডিপি'র ঋণ বিতরণের চিত্র

ব্র্যাক সদস্যদের ঋণ প্রদান, ঋণের ব্যবহার ও মুনাফা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা

আরডিপি'র মাসিক সভা: মতলবের দশটি গ্রাম সংগঠনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

পারটিসিপ্যাটরি রুরাল এ্যাপ্রাইজাল: ব্র্যাক কর্মসূচিতে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়

গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির ভূমিকা

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণে জটিলতা: একটি সমীক্ষা

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপনকারী ছেলে-মেয়েদের অর্জিত মৌলিক দক্ষতার মূল্যায়ন

গ্রামীণ বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও স্কুলে ভর্তির হার: ব্র্যাকের ভূমিকা

গণকেন্দ্র পাঠাগারের অবস্থা: একটি সমীক্ষা

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক পুনর্ব্যবহার: একটি সম্ভাব্যতা যাচাই

স্বাস্থ্য বিষয়ক

জাতীয় টিকা দিবসের সংগঠন এবং বাস্তবায়ন: ১৯৯৬ পর্বের একটি মূল্যায়ন

বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে টিকাদান কর্মসূচির মূল্যায়ন

ব্র্যাকের এআরআই কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ

মহিলাদের অসুস্থতা বিষয়ক একটি সমীক্ষা

প্রজনন স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে জন্ম ও মৃত্যুর রেকর্ডকৃত কার্যাবলীর মূল্যায়ন

প্রসব-পূর্ব সেবায় কর্মসূচি সংগঠকের ভূমিকা

পরিবার পরিকল্পনা: একটি সমীক্ষা- গ্রামের মহিলাদের জন্য প্রয়োজন সঠিক ও কার্যকর ধারণা

গ্রামীণ এলাকায় প্রসব পরবর্তী সময়ে জন্মনিরোধক ব্যবহারের ধরণ

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব

পুষ্টি উন্নয়নে পরিপূরক খাবার: মুক্তাগাছা পাইলট প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন

পরিপূরক খাবার সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণা: মুক্তাগাছায় ব্র্যাকের একটি পাইলট সমীক্ষা

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে ল্যাট্রিন বিক্রয় কতটুকু ফলদায়ক?

অনুন্নত এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুস্বাস্থ্যের ভূমিকা

ব্র্যাকের কয়েকটি উলেখযোগ্য সাম্প্রতিক গবেষণা (১৯৯৭-৯৮)

দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়ন: ব্র্যাকের পলীউন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব মূল্যায়ন

আর্সেনিক পরীক্ষায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থ নির্গমন: একটি পরিবেশগত সমীক্ষা

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্র: আর্থিক সংস্থান ও ব্যয়ের প্রেক্ষিতে কার্যকারিতা

খণ্ড ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

সম্পাদকীয়

ব্র্যাকের গবেষণা বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা- একটি প্রতিবেদন

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠন বিলুপ্ত হয় যে কারণে

মহিলাদের স্বাধিকার ও সমাজীকিকরণের উপর ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব

পরিবারে খাবার বন্টন ও লিঙ্গবৈষম্য: ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত

সদস্য খানার উপর একটি সমীক্ষা

পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দেয় ঋণের কিস্তি পরিশোধের উৎস: একটি সমীক্ষা

দুঃস্থ মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক সহায়তা কর্মসূচির উপর একটি সমীক্ষা

ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক পোষ্টারের বিরূদ্ধে মিছিল, প্রতিবাদ ও সমাবেশ

ভাল থাকা সম্পর্কে গ্রামীণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি

গ্রাম সংগঠনে ক্ষুদ্র দলের ভূমিকা

বাওড় এলাকায় ব্র্যাকের ক্ষুদ্র জেলে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব

ঋণ কর্মসূচি, ক্ষমতায়ন এবং জন্মনিরোধ: পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

স্বাস্থ্য বিষয়ক

পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি

শালদুধের পরিবর্তে অন্য তরল খাবার দেয়ার প্রবণতা: মতলব থানার একটি চিত্র

ব্র্যাক সদস্য এবং লক্ষীভূত খানার পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা

কিশোর-কিশোরীদের যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা: প্রয়োজন উপযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম

বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কৃমির প্রাদুর্ভাব

পুরুষ ও মহিলাদের রক্তস্বল্পতা নিয়ে একটি সমীক্ষা

নির্যাস ৭০

গ্রামীণ মহিলাদের মাধ্যমে এইড্স বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি: ব্র্যাকের একটি পাইলট প্রকল্প

শরীরচিত্র অংকনের মাধ্যমে জন্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে মহিলাদের ধারণা নির্ণয়

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্জ্য নিষ্কাশন: একটি পরিবেশগত সমীক্ষা

ব্র্যাকের উলেখযোগ্য সাম্প্রতিক গবেষণা (১৯৯৮-৯৯)

১৯৯৮-এর বন্যা ও বন্যাকবলিতদের উপর ব্র্যাকের একটি ত্বরিত সমীক্ষা

আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি: পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি বেজলাইন জরিপ

নতুন বসানো টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণ

কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি ও সংকর প্রজাতির গবাদিপশু এবং মোরগ-মুরগীর টিকার ব্যবহার সংক্রান্ত সমীক্ষা